অনেকের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-২০

হঠাৎ গাওয়া গান

প্রথম প্রকাশ

১৯৬২

প্রকাশক :

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২, রোল্যাণ্ড রোড,

কলকাতা-২০

৪৮-২০২২

লেখিকা পরিচিতি,

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ :

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস

৬ এ. এস. এন. ব্যানার্জী রোড

কলিকাতা—১৩

মুদ্রক :

সুমুদ্রণ

১৪. রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা—৯

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

ডা. কিশোর সিংহ
করকমলেষু

অলক

আচ্ছা, আপনি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন কি?

কী একটা রোগ আছে যেন, যাতে মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়, গোলোকবিহারীরও অনেকটা সেরকম। আমার হিসেবে গোলোক তিপ্পান্ন বা চুয়ান্নর বেশি নন। দেখলে মনে হবে আশি পেরিয়ে গেছেন। চোখে অত্যন্ত ভারী কাচের চশমা, মাথায় সামান্য টাক, শরীর একটু ঝোঁকা এবং যথেষ্ট জীর্ণ। প্যান্ট এবং শার্ট পরেন বটে, কিন্তু কোনও পোশাকেই তাঁকে মানায় না। দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে, ইনি ছোনে মস্তানের বাবা। আমার ধারণা, ছোনে মস্তানের বাবা হওয়ার জন্য যে-মিনিমাম বুকের পাটা দরকার, তা গোলোকবাবুর নেই বা ছিলও না। কিন্তু পৃথিবীর অনেক বিস্ময়কর ঘটনার মতোই তিনি বাস্তবিক ছোনের বাবা। গোলোকবাবুর নানাদিকে বিস্তর খামতি আছে বলেই আমি জানি। তবে তার তালিকা তৈরির কোনও চেষ্টা আমি করিনি, কারণ তিনি ততটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। তবে দৃশ্যমান যেসব বিষয়ে তিনি একটু কমা আছেন তা হল তাঁর অতি ধীরে চলা-ফেরা, কোনও জিনিস বুঝতে বা অনুধাবন করতে বিস্তর সময় লাগা, কানে ও চোখে কম শোনা ও দেখা এবং প্রায় সময়েই আপনমনে বিড়বিড় করা।

তিনি আমার ইনকাম ট্যাক্সের উকিলের কর্মচারী। তিনি ছোনের বাবা, এই বিপজ্জনক সত্যটিকে উপেক্ষা করলে গোলোকবাবু অতি নিরীহ, সজ্জন এবং বিনয়ী মানুষ।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না গোলোকবাবু, আমি ঈশ্বর, মন্ত্র-তন্ত্র, ধর্ম-টর্ম, তাগা-তাবিজ, ভূত-প্রেত বা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না।

অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষ করলে বিশ্বাস করবেন কি?

আগে তো প্রত্যক্ষ করি, তারপর ভেবে দেখা যাবে।

আপনি সবলচিত্ত পুরুষ।

সবলচিত্ত না হলেও লজিক্যাল বলতে পারেন। কিন্তু ব্যাপার কী গোলোকবাবু, আপনি কি আমাকে অতিপ্রাকৃত কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছেন? সম্প্রতি ভূত-টুত কিছু দেখেছেন নাকি?

গোলোকবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, না না, তেমন কিছু নয়।

আরে, লজ্জা পাচ্ছেন কেন? ভূত-প্রেত বিশ্বাস না করলেও ভূতের গল্প পড়তে বা শুনতে আমি খুবই পছন্দ করি।

গোলোকবাবু খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ফাইলপত্র নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কী ভেবে ফের বসে পড়লেন। তারপর বললেন, না না, সে তেমন কিছু নয়। বেশ, আর একদিন বলব না হয়।

কাচের দরজা দিয়ে একটা সাইকেলের সামনের চাকাটা দেখা যাচ্ছে, আর হ্যান্ডেল। সাইকেলটা বেশ পুরনো, ধুলোটে এবং বোধহয় গোলোকবাবুর মতোই ধীরগতিসম্পন্ন। তবু

বলতে হবে, এই একটিমাত্র সাহসিকতার কাজ গোলোকবাবু করে থাকেন। এটা মফস্‌সলের একটা জেলা। শহর হলেও রাস্তাঘাট জনাকীর্ণ, যানবহুল এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ। গোলোকবাবু এইসব বিপজ্জনক রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন মক্কেলের বাড়ি থেকে ইনকাম ট্যাক্সের কাগজপত্র আনতে যান, বিভিন্ন অফিসে চিঠিপত্র পৌঁছে দেন ও অন্যান্য কাজ করেন।

সাইকেল চালাতে বিশেষ দক্ষতার দরকার হয় না বটে, কিন্তু এই সদাব্যস্ত জনাকীর্ণ শহরে ত্রিশ বছর ধরে তেমন কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই সাইকেল চালিয়ে যেতে হলে কি একটু ভাগ্যেরও দরকার হয় না?

হঠাৎ মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে আমার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে থেকে গোলোকবাবু বললেন, হয়।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, কী হয়?

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার কিন্তু এখনও হয়।

আমি হাঁফ ছাড়লাম। কারণ উনি যেভাবে 'হয়' বললেন তাতে হঠাৎ মনে হল উনি আমার মনের কথা শুনতে পেয়ে গেলেন নাকি! বললাম, আপনি মশাই ভাগ্যবান। এই এত বয়স অবধি আমার পোড়া চোখে কোনও অতিপ্রাকৃত দেখতে পেলাম না।

আপনার বয়স কত?

তা মন্দ হবে না।

অভিজ্ঞতা হতে তো সময়ও লাগে। আপনি তো ইয়ং ম্যান।

তবে অতিপ্রাকৃত যে একেবারে হয় না তাও নয়। স্বয়ং

গোলোকবাবুই তো এক অতিপ্রাকৃত। না হলে তাঁর মতো মানুষের ছোনে মস্তানের মতো ছেলে হয় কী করে? দিনসাতেক আগেই হাইওয়েতে ছোনে একটা ইলেকট্রনিক জিনিস বোঝাই লরি লুট করেছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। এমনও কানে আসে যে, এই শহরের পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত রুস্তমরাও তার দাপটে খানিকটা ম্রিয়মাণ। সোজা কথা, নবোদিত-রুস্তম ছোনে বেশ পয়সা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে। তাতে অবশ্য গোলোকবাবুর কোনও অবস্থান্তর ঘটেনি। ছোনে তার বাপ-মায়ের ছায়াও মাড়ায় না। উলটে ছোনে অ্যাকশন করে গা-ঢাকা দিলে পুলিশ তাকে খুঁজে না পেয়ে একসময়ে গোলোকবাবুর ওপর চড়াও হত। কয়েকবার তাঁকে থানায় ধরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু গোলোকবাবুকে নাড়াঘাঁটা করে পুলিশ বুঝতে পেরেছে যে, এঁকে উৎপীড়ন করে কোনও লাভ নেই। তাই আর তারা গোলোকবাবুর পিছনে মেহনত খরচ করে না। আবার এমনও হতে পারে যে, ইতিমধ্যে ছোনের সঙ্গে পুলিশের একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

আমি বললাম, অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার জন্য কি বয়স বেশি হওয়া দরকার?

গোলোকবাবু ভারী মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি কথার পিঠে কথা কইতে জানেন না, ভারী বিব্রত বোধ করেন। কুণ্ঠিত গলায় বললেন, না, ঠিক তা নয়। আমি বোধহয় অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমার এরকমই হয়, এক কথা বলতে গিয়ে কেন যেন অন্য কথা বলে ফেলি।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আপনি কোনও অসংগত কথা তো

বলেননি। কাঁচা বয়সে মানুষ অনেক কিছু উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু বয়স হলে বিবেচনা আসে। যৌবনের অনেক নাস্তিকই, বয়সকালে পরম আস্তিক হয়ে ওঠে।

চোখ নয়, গোলোকবাবু চশমাটাই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

আপনার অতিপ্রাকৃত ঘটনাটা কী গোলোকবাবু?

গোলোকবাবু একটু কুঁকড়ে গেলেন, তাঁর চশমার উজ্জ্বলতাও নিভে গেল। সসংকোচে বললেন, সেটা বলতে আমি বড় কুণ্ঠাবোধ করছি।

কুণ্ঠা! কুণ্ঠাবোধ করেন কেন?

বড় অপরাধবোধ হয়।

আপনি তো অপরাধ করার মানুষ নন। তবে কুণ্ঠা কীসের?

এবার তাঁর চশমা মলিন এবং অস্বচ্ছ হয়ে গেল। তিনি এখন প্রবল দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। হয় বিড়বিড় করছেন অথবা স্নায়ুর চাপে ঠোঁট কাঁপছে। একটু চিন্তা করলেন বোধহয়। কিন্তু গোলোকবাবুর মতো মানুষ এত সহজে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, খুব ছেলেবেলায় আমার একবার টাইফয়েড হয়েছিল। দু'মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। তখন টাইফয়েডের তেমন ওষুধ ছিল না।

হ্যাঁ। তা জানি।

যখন অসুখ সারল তখন দেখা গেল আমার কোনও অঙ্গহানি হয়নি, তবে আমি যেন একটু বোকা হয়ে গেছি।

সেটা কী করে বুঝলেন?

মা বাবা বলত, স্কুলের বন্ধুরা বলত, পরীক্ষায় নম্বর কম

পেতে থাকলাম। লোকের কথা বুঝতে সময় লাগত, বই পড়তে গেলে টের পেতাম যে, মাথায় কিছু সহজে ঢুকছে না।

কিন্তু হঠাৎ সেই টাইফয়েডের কথা উঠছে কেন?

আসলে আমি বোঝাতে চাইছি যে, আমি বুদ্ধিমান লোক নই।

ওটা আপনার মনগড়া ধারণা।

আপনি কি আমাকে একজন বুদ্ধিমান লোক বলে মনে করেন?

কী মুশকিল! আপনাকে বোকা বলেও তো মনে হয় না আমার।

কিন্তু অলকবাবু, আমি বাস্তবিকই ভীষণ বোকা। আর সেই জন্যই যে-কোনও গুরুতর সিদ্ধান্তে আসতে আমার একজন পরামর্শদাতা বড় প্রয়োজন।

বুঝলাম। কিন্তু কেন হঠাৎ পরামর্শদাতা খুঁজছেন?

ওই অতিপ্রাকৃত ঘটনার জন্য। ওটা কাউকে বলা দরকার। নইলে আমি বড় মনোকষ্টে ভুগছি, বড্ড ভয় পাচ্ছি, বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে নিজেকে।

আপনি আমার কাছে কোনও পরামর্শ চান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি আমাকে কখনও অনাদর বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন না।

আমি একটু অস্বস্তিবোধ করলাম। গোলোকবাবু নিশ্চয়ই টের পান না যে, মুখে একটা সৌজন্য বজায় রাখলেও ভিতরে ভিতরে আমি ওঁকে যথেষ্টই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকি এবং গুরুত্ব দিই না। আমি মিষ্টি করে বললাম, আপনাকে কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে গোলোকবাবু?

যাদের সঙ্গে রোজ আমার দেখা হয়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমি তাচ্ছিল্য করার মতোই লোক। আমার ব্যক্তিগত গুণ বা সামাজিক গুরুত্ব নেই, আমি জানি।

ওসব কথা থাক। এবার বলুন আমার কাছে আপনি কী পরামর্শ চান।

অনেক ভাবনা-চিন্তা এবং আগুপিছুর পর আমার মনে হল একমাত্র আপনার কাছেই ঘটনাটা বলা যায়। আপনি উচ্চশিক্ষিত লোক, বিলেতফেরত, কৃতী।

আমি সামান্য হাসলাম এবং প্রতিবাদ করাটা বাহুল্যদ্বিধায় করলাম না।

গোলোকবাবুর চশমার কাচ এখন ঘোলাটে ও মেদুর। সেই কাচ আমার মুখে স্থাপন করে তিনি বললেন, বছর দুই আগে আমার ছোট মেয়ের অ্যাপেন্ডিসাইটিস হওয়ায় আমি বড় বিপদে পড়ে যাই। বাধ্য হয়ে শাবলরামের হাতে পায়ে ধরে আমি দশ হাজার টাকা ধার করেছিলাম। শাবলরাম প্রচুর সুদে ধার দিয়েছিল। টাকাটা আমি শোধ দিয়ে উঠতে পারিনি। সুদে-আসলে সেই টাকা বেড়ে এখন ত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে। কয়েকদিন আগে শাবলরাম লোক পাঠিয়ে আমাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। মানুষের লাথিঝাঁটা খেয়ে আমার অভ্যাস আছে। অপমান আমার বেশ সয়। তবে শাবলরাম সেদিন আমার বাপ-মা তুলে গাল দিয়েই ছাড়েনি, আমাকে জুতো মারতেও উঠেছিল। রাগ বা অভিমান আমার কদাচিৎ হয়। আমার মাত্র দুটো প্রতিক্রিয়াই সর্বদা ঘটে, ভয় আর দুশ্চিন্তা। কিন্তু অলকবাবু, কী বলব আপনাকে, সেদিনই প্রথম

টের পেলাম আমার ভিতরে একটু রাগও যেন এতকাল কোনও গোপন গর্তে লুকিয়ে ছিল। মুখে আমি কিছু বলতে পারিনি বটে, কিন্তু—

কিন্তু?

কিন্তু শাবলরাম যখন তার ভারী রবারের চটিটা তুলে আমার গালে সপাটে এক ঘা বসিয়ে দিল, আর তা দেখে যখন তার চাকর-বাকর আর কর্মচারীরা হি হি করে হাসছিল, আর শাবলরাম যখন আরও এক ঘা মারার জন্য চটিটা তুলেছে তখনই আমার ভিতরকার ওই রাগটা যেন ঘুম ভেঙে ফোঁস করে ফণা তুলল। খুব রাগ হল আমার। খুব রাগ হল। ভীষণ রাগ হয়ে গেল। এরকম রাগ আমার কখনও হয়নি। মুখে আমি কিছুই বলিনি। কিন্তু মনে মনে উন্মাদের মতো বলে ফেলেছিলাম, এ লোকটা আমাকে প্রকাশ্যে জুতো মারছে! জুতো মারছে! এটা তো ভীষণ অন্যায়! লোকটার শিক্ষা হওয়া উচিত! মরুক। লোকটা এক্ষুনি মরে যাক!

তারপর কী হল?

গোলোকবাবুর চশমা হঠাৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেল। উনি খানিকক্ষণ কী যেন বিড়বিড় করলেন। তারপর নেতিবাচক মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বিশ্বাস করবেন না। অবিশ্বাস্য! আমি ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাবলরাম যেন বজ্রাহতের মতো থেমে গেল। প্রথমে হাত থেকে চটিটা খসে পড়ল, তারপর চোখ উলটে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে তার সে কী আকুলি-বিকুলি! দম নিতে পারছে না, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে,

আঁ আঁ করে আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। লোকজন ছুটে এসে ধরাধরি করে তাকে তোলে, হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা যায় শাবলরাম।

আমার গা একটু শিরশির করছিল। কেন কে জানে। গোলোকবাবুর অন্ধকার চশমা আমাকে দেখছে। কথা বলতে গিয়ে দেখি, গলাটাও একটু ফেঁসে গেছে, পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বটে। তবে—

কথাটা আমি শেষ করলাম না। কারণ আমার কোনও বক্তব্য তৈরি নেই।

গোলোকবাবুর ভাষাহীন চশমা নীরবে আমাকে মাপজোক করে যাচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তির পর গোলোকবাবু প্রায় ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝলেন?

মাথা নেড়ে সত্যি কথাই বললাম, না।

গোলোকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বোঝার কথাও নয়, অতিপ্রাকৃত ঘটনার কি কোনও ব্যাখ্যা হয়?

জবাব দিতে গিয়ে দেখলাম, এখনও আমার কোনও জবাব তৈরি হয়নি। তবে আমি স্পষ্টতই একটা অস্বস্তি বোধ করছি। শাবলরাম খাণ্ডেলওয়ালকে আমি চিনতাম। একথাও ঠিক যে, দিন দশেক আগে শাবলরাম হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ মারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে খুব সাদামাটা ঘটনা। হার্ট অ্যাটাকে প্রতিনিয়তই সারা দুনিয়ায় বিস্তর লোক মারা যাচ্ছে। শাবলরামের মৃত্যু নিয়েও তাই মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না। কিন্তু কী বলব তা ভেবে পাচ্ছি না।

গোলোকবাবু হঠাৎ তেমনই ফিসফিস করে বলে উঠলেন, ভেবে পাবেনও না।

এই নিয়ে আজ সন্ধেবেলা দ্বিতীয়বার গোলোকবাবু আমাকে চমকে দিলেন। উনি কি আমার মনের কথা শুনতে পেলেন নাকি? এ তো বড় মুশকিলেই পড়া গেল তা হলে! অন্তর্যামিত্ব একটা মহৎ গুণ বটে, কিন্তু কাছাকাছি কোনও অন্তর্যামী ঘুরঘুর করলে যে আমাদের মতো পাপী-তাপীর ভীষণ অসুবিধে! মুখের কথা চেপে রাখা যায় বটে, কিন্তু মনের কথা চেপে রাখার যে কোনও উপায় নেই!

গোলোকবাবু খুব চিন্তিতভাবে বললেন, আমি একটা কথা ভাবছি। বলব?

বলুন।

এই ঘটনার জন্য আমাকে দায়ী করা যায় কি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। কারণ, ঘটনাটা কাকতালীয়।

গোলোকবাবু আমার কথাটা বুঝে উঠতে একটু যেন বেশিই সময় নিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, কাকতালীয় বললে দায় এড়ানো যায় বটে। কিন্তু মনের খচখচানিটা যায় না যে! বড় মনোকষ্টে ভুগছি।

আজকাল অভিসম্পাতের কোনও জোর নেই। থাকলে কানাইয়ের মায়ের শাপশাপান্তে কবেই তার ভাসুর নবকৃষ্ণ পটল তুলত। আপনি বাড়ি যান। এসব নিয়ে আর ভাববেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলোকবাবু উঠলেন। ধীরগতি

মানুষ। উঠতে অনেকটা সময় লাগল। উঠতে উঠতে বললেন, আপনি কি ঘটনাটা নিয়ে আরও একটু ভাববেন?

কেন?

আমার মনে হয়, ঘটনাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

ঘটনাটা কাকতালীয় হলেও ভদ্রলোক আমাকে একটু চিন্তায় ফেলে গেলেন। গোলোকবিহারী একজন অতিশয় দুর্বলচিত্ত, দিশাহীন, নির্জীব মানুষ। সর্বদাই সব পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। পৃথিবীর কোনও ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য এঁর নেই। তবু আমার দুর্বল নাস্তিকতা একটু পিছু হটে গেছে এবং আমি একটু উদ্বেগ বোধ করছি। ঘটনাটা যদি কাকতালীয় না হয়ে থাকে?

আমার দিদি অনসূয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল ভীষণ ভাল। ঠিক পিঠোপিঠি নই, দিদি আমার চেয়ে ছয় বছরের বড়। আমি একটু হার্মাদ গোছের ছেলে ছিলাম বটে, কিন্তু দিদির সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়াঝাটি বা মারপিট হত না। বরং যে-কোনও সমস্যায় মায়ের চেয়ে দিদিই ছিল আমার কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য। আর দিদিও পরম বাৎসল্যে আগলে আগলে রাখত আমাকে। অনেকবার মিথ্যে কথা বলে বাবা বা মায়ের কাছে আমার পিঠ বাঁচিয়েছে। দিদির যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স তখন কী যেন একটা অসুখ হল। আর তখনই হাম্বির রায় নামে একজন অল্পবয়সি ডাক্তার দেখতে এল তাকে। আমাদের পারিবারিক বুড়ো ডাক্তার রমেন ভট্টাচার্য মারা যাওয়াতেই এই নতুন ডাক্তারের আগমন। হাম্বির নতুন হলেও বেশ ভাল ডাক্তার। চেহারাও খারাপ নয়, আর খুব ভদ্র। রোগিণী আর

ডাক্তারের প্রেম নতুন কিছু নয়, আকছার হচ্ছে। এক্ষেত্রেও হল। তবে একটু একতরফা। হাম্বির দিদির প্রেমে পড়ল বটে, কিন্তু দিদি আবার ততটা ঢলল না। ফলে দু'পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ বা সিনেমা-টিনেমায় যাওয়া, রেস্তরাঁয় খাওয়া এসবের বালাই ছিল না। হাম্বিরের এক বন্ধুর মাধ্যমে সোজা বিয়ের প্রস্তাব পেশ হয়ে গেল। বাবা, কাকা আর জ্যাঠামশাই প্রস্তাবটা খুব নিবিষ্টভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখে মতও দিয়েছিলেন। দিদিও খুব একটা অরাজি ছিল না।

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু মুশকিল বাধল যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের পাকা কথা বলতে হাম্বিরের বাবা মহীদেব আর মা সুপ্রিয়া আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁরা বেশ কায়দাবাজ, ফ্যাশনদুরস্ত এবং ডাঁটিয়াল মানুষ। অহংকারী তো বটেই। কথাবার্তায় আমাদের বাড়ির প্রতি তাঁদের তাচ্ছিল্যই প্রকাশ পাচ্ছিল। সে তবু সওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা শেষে ছেলের আমেরিকায় যাওয়ার রাহাখরচ দাবি করে বসলেন।

আমাদের চার পুরুষের স্বদেশি করা বংশ। অনেক স্বদেশি সংস্কার এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে। এ বংশে খদ্দর ছাড়া বহুকাল অন্য পরিধেয় ঢোকেনি। সেই খদ্দর জ্যাঠামশাই অবধি এসে অবশেষে থেমেছে। কিন্তু খদ্দর থামলেও ভ্যালুজ থামেনি। সুতরাং মহীদেব এবং সুপ্রিয়া দেবীর দাবি পত্রপাঠ নস্যাৎ হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই বেশ দৃপ্ত কণ্ঠেই বলে দিলেন, কোনওভাবেই পণ দেওয়া সম্ভব নয়। মহীদেব ও সুপ্রিয়া অপমান বোধ করে বিদায় হলেন। বিয়ে ভেঙে গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘটনার এক মাসের মধ্যেই আমার

মাসি দিদির জন্য আমেরিকাবাসী এক উজ্জ্বল পাত্রের সম্বন্ধ আনলেন। সেই পাত্র তখন এ দেশেই। ঝটপট একদিন বিকেলে পাত্রের বাড়ির লোকজন এসে দিদিকে দেখে পছন্দ করে ফেলল। স্বদেশি করা বাড়ি শুনে তারা ভীষণ ইমপ্রেসড। অথচ এই ব্যাপারটাকে মহীদেব আর সুপ্রিয়া আমলই দেননি। এবং আরও একমাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। জামাইবাবু ইঞ্জিনিয়ার এবং ভারী সজ্জন।

দিদির যে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে এবং সেটা আমেরিকাতেই, এটা হাম্বির স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রাথমিক প্রত্যাখ্যান সামলাতে একটু স্ট্র্যাটেজিক সময় নিতে চেয়েছিল হাম্বির। তারপর মা-বাবার অমতেই হয়তো দিদিকে বিয়ে করত। কিন্তু সেই ফাঁকটাও সে পেল না।

এইসব কথা আমি আরও কয়েক বছর পরে হাম্বিরের কাছেই জানতে পারি। শেষ অবধি হাম্বিরের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তার বাবা মারা যায় এবং দুটো অনূঢ়া বোন ও এক নাবালক ভাইয়ের দায় তাকে বহন করতে হয়। শোনা যায়, ছাত্রজীবনে নকশাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য তার পুলিশ রেকর্ডও ভাল ছিল না। তাই ভিসা মঞ্জুর হয়নি। বিদেশে না গেলেও হাম্বির ক্রমশ ডাক্তার হিসেবে খুবই খ্যাতি অর্জন করে। এখন তার পসার এ শহরে সবচেয়ে বেশি। শহরের সবচেয়ে অভিজাত নার্সিং হোমটার মোটা শেয়ারও তার।

আমি সাবালক হওয়ার পর হাম্বির একদিন দুঃখ করে বলেছিল, তোমরা আমার জন্য একটু অপেক্ষাও তো করতে

পারতে! আমি তো অনসূয়াকেই বিয়ে করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। তোমরা এত তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা অন্য জায়গায় ঠিক করে ফেললে কেন?

আমি সমবেদনার গলায় বলেছিলাম, আপনাকে তো আমাদের বাড়ির সবাই পছন্দই করেছিল। কিন্তু পণ নিয়ে কী একটা গণ্ডগোল হওয়ায় কেঁচে গেল। জানেন তো, আমাদের স্বদেশি বাড়ি।

জানি। আমার বাবা তো ঠিক পণ হিসেবে চায়নি। একটা লোন হিসেবেই চেয়েছিল। আর সেটা দাবিও ছিল না, জাস্ট একটা প্রপোজাল।

আমি ভালমানুষের মতো বলেছিলাম, সেসব তো আমার জানা নেই হাম্বিরদা।

সে তো ঠিক কথা। তুমি তখন আর একটু ছোটই ছিলে। কিন্তু কী জানো, আমি আজও অনসূয়াকে ভুলতে পারিনি।

লোকটার প্রতি সেই থেকে আমার একটা মায়া জন্মাল। এমনিতে হাম্বির রায় মানুষ খারাপ নয়। আর যত যাই হোক, লোকটা তো আমার দিদিকে ভালবেসেই একটু দিওয়ানা হয়ে গেল।

ত্রিশ পেরিয়ে বিয়ে করেছিল হাম্বির। আমার দিদিরই এক বান্ধবী রীতাদিকে। রীতাদি গার্লস স্কুলে পড়ায় এবং ভরতনাট্যমের বিশেষজ্ঞা। হাম্বিরের বিরহদশা হয়তো কেটে গেছে। তবে সুগন্ধের শূন্য শিশিতে হয়তো একটু সুবাস লেগে থাকতেও পারে আজ অবধি।

সেই থেকে হাম্বিরের সঙ্গে আমার বেশ ভাব। আমি তার

বিয়ের নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম। আর এখন আমার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে আমি হাম্বিরের কাছেই যাই। বলা বাহুল্য আমার ভিজিট লাগে না এবং ভিড় থাকলেও আমার কাছে তার চেম্বার অবারিতদ্বার।

যতদূর জানি শাবলরাম খাণ্ডেলওয়ালের মৃত্যু হয়েছিল হাম্বির রায়ের জীবনদীপ নার্সিং হোমেই। কাজেই আমি হাম্বির রায়ের চেম্বারেই ফোন লাগালাম।

হাম্বিরদা আছেন?

আছেন। কিন্তু চেম্বারে আজ প্রচুর পেশেন্ট। ফোন ধরছেন না।

বলুন অলক কথা বলতে চায়।

ও, আচ্ছা ধরুন, দিচ্ছি।

একটু বাদেই হাম্বিরদা বলল, কী রে অলক, কী হয়েছে?

কিছু নয়। জানতে চাইছি শাবলরাম খাণ্ডেলওয়ালের কী হয়েছিল।

হার্ট অ্যাটাক।

আচ্ছা, শাবলরাম কি মারা যাওয়ার সময় কিছু বলেছিল?

কেন রে, কোনও কনফিউশন আছে নাকি?

না হাম্বিরদা, এমনি জাস্ট একটা কৌতূহল।

তাই বল। কিন্তু শাবলরামকে তো আমি অ্যাটেন্ড করিনি। নিরঞ্জন সেন করেছিল। আর শোভনা ছিল ওর কেবিনের নার্স। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।

ছোট শহরের এই এক সুবিধে। সকলের সঙ্গেই কোনও না কোনও সূত্রে যোগাযোগ বেরিয়ে পড়ে। শোভনা দত্ত আমার বন্ধু সুভাষের দিদি।

শোভনাদি প্রশ্ন শুনে বললেন, এই তো মুশকিলে ফেললে! রোজ এত রুগি ঘেঁটে কিছু কি মনে থাকে? যতদূর মনে আছে শাবলরামেব কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না।

আপনি কি শিওর যে হার্ট অ্যাটাকেই ওর মৃত্যু হয়?

আমি তো ডাক্তার নই। তবে ডেথ সার্টিফিকেটে ডক্টর নিরঞ্জন সেন তো তাই লিখেছিলেন। এত সব জানতে চাইছ কেন? কমপ্লিকেশন আছে নাকি?

না শোভনাদি, তবে একটা ব্যাপার হয়েছে। পরে বলব।

বুঝতে পারছি না, এভাবে আমি কোথায় পৌঁছোতে চাইছি। এই সব বৃথা প্রশ্নের তো কোনও মানেই হয় না! শাবলরাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, খুন হয়নি, কাজেই মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে খুনির নাম বলে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। তবে আমি আনাড়ির মতো কাঁচা তদন্ত করার চেষ্টা করছি কেন? মাথা থেকে এই পোকা না তাড়ালে তো মুশকিল।

একসময়ে আমি শাবলরামের কমপিউটারের কিছু কাজ করে দিয়েছিলাম। তখনই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। সে ধূর্ত লোক। শাবলরামের মতো মানুষদের চিন্তাভাবনা সর্পিল পথে চলে। হাস্যহীন মুখ এবং তীক্ষ্ণ চোখে একটু শীতল নিষ্ঠুরতা টের পাওয়া যেত। একটা টায়ারের দোকান আছে তার। আর পাইকারি বাজারে দানা শস্যের আড়ত। রসকষহীন, সংস্কৃতিহীন, অর্থকেন্দ্রিক এইরকম মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাই কঠিন। এরা যে-কোনও মানুষকেই অর্জন করতে পারে না, কেবল টাকায় কিনে রাখে। তার মৃত্যুতে কারও কোনও শোক-টোক হয়েছে বলে জানি না। শাবলরামের

ছেলে বিষ্ণুকে তো আমি পরদিনই সকালে মোটরবাইকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তবে শাবলরাম আমার একটা উপকার করেছিল। আমার বাল্যপ্রেমিকা, পরবর্তীকালে বান্ধবী এবং আরও পরবর্তীকালে বন্ধুপত্নী শ্রুতির বাবা স্মৃতিময় দত্ত তাঁর বাড়ি বিক্রি করা নিয়ে সমস্যায় পড়েন। মূল দলিলটা হারিয়ে গিয়েছিল বলে বাড়ি বিক্রি হচ্ছিল না। শাবলরাম খাণ্ডেলওয়াল বাড়িটার দর দিয়েও দলিল নেই বলে পিছিয়ে যায়। শ্রুতি এসে আমাকে ধরে, তোমার সঙ্গে তো শাবলরামবাবুর খুব খাতির আছে, একটু বলে দাও না। অবশেষে আমার কথায় শাবলরাম শুধু সার্টিফায়েড কপির জোরেই বাড়িটা কেনে। কেবল আমাকে বলেছিল, কিনে কোনও ঝামেলায় পড়ব না তো! আপনি জামিন থাকবেন?

আমি বলেছিলাম, থাকব।

আপনি লাহিড়ি ফ্যামিলির ছেলে। আপনাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই কথায় আমি আপ্লুত হয়েছিলাম। একজন মানুষের সামাজিক অবস্থানের পক্ষে তার পরিবারের সুনাম যে কতটা কাজ করে তা আমরা সবসময়ে বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন দেখি আমার বাবা বা জ্যাঠামশাই, বিশেষ করে জ্যাঠামশাই রাস্তায় বেরোলে অনেকে সাইকেল থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে যায় বা পায়ে হাঁটা মানুষজন থেমে গিয়ে শশব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় বা অনেকে প্রণাম করে, তখন মনে হয়, এই স্বদেশপ্রেমহীন জীবনযাত্রায় এখনও মানুষ আমাদের পরিবারকে গড্ডলিকাপ্রবাহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেনি।

আমি আমেরিকায় যাওয়ার আগে জ্যাঠামশাই আমাকে ডেকে খুব সহৃদয়ভাবে বলেছিলেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা এ দেশকে আর নিজের দেশ ভাবে না, তা জানিস? তারা ভাবে সুযোগ পেলেই তারা আমেরিকা, ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে শিকড় গেড়ে বসবে। তোর মনেও কি তাই? খোলসা করে বল তো বাবা!

আমি বলেছিলাম, আপনি তো জানেন, আমার নিজের তেমন ইচ্ছে ছিল না। দিদির জোরাজুরিতেই যেতে হচ্ছে। দিদির খুব ইচ্ছে আমি ওর কাছাকাছি থাকি।

বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকতে হয় সে অন্য কথা। কিন্তু এখনকার ঝোঁকটা তো তা নয়। ভারত থেকে ইংরেজ তাড়ানো গেল, কিন্তু ইংরেজির ভূত ঘাড়ে চেপে বসে রইল। তাকে তাড়ানোর উপায় নেই। দেশটা স্বাধীন হল বটে, কিন্তু কারও আপন হল না। সবাই বিদেশকে স্বদেশ ভেবে পা বাড়িয়ে থাকলে, পালাই-পালাই করলে বড় লজ্জার কথা হবে যে!

আপনি চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই, আমি সিটিজেনশিপ নেব না।

দিদি আমাকে ওই দেশে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিল বটে এবং আমার সবিশেষ আগ্রহই ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভোররাত্রির বিমান যখন ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে আরব সাগরের আকাশে ঢুকে পড়ল, তখনই হঠাৎ আমার ভিতর যেন সব আলো-টালো নিভে গেল, মন স্তব্ধ; মাথা শূন্য, এক তীব্র বিষণ্ণতা ভারী তালার মতো ঝুলে রইল বুকের ভিতরে। অতি সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট একটু খুঁটে খেয়ে খিদে সত্ত্বেও বিস্বাদে

ভরে গেল মুখ। কেবল বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, কাকা, কাকিমা আর আমার নানা বয়সি ভাইবোনদের মুখ ভিড় করে এল চোখের সামনে। আমাদের বাড়ি, তার আনাচ-কানাচ, আমাদের পাড়া, শহর সব খুঁটিনাটিসহ এবং নানা চেনা-আধচেনা মানুষজন যেন চুম্বকের মতো টানতে লাগল পিছনে। কে জানে সেটাই স্বদেশচেতনা কি না।

এমনকী যে সব বাল্যবন্ধুর সঙ্গে বহুকাল সম্পর্ক নেই এবং সম্পর্ক আবার গড়ে তোলার ইচ্ছেও ছিল না, তাদের মুখ মনে পড়েও বুকটা হু হু করতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে গিরিধারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ছানার গজা কিনে খাই। কিংবা মংলাতলার মাঠে বসে ঘুড়ি কাটাকাটির লড়াই দেখি। কিংবা ফ্যান্সি মার্কেটের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াই। বাড়ির আর কেউ নয়, কেবল কাকাই যা আমাকে বিদেশে যাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে বলেছিল, আরে যা, গিয়ে লাইফটা দেখে আয়। বিদেশ-টিদেশ না গেলে কি আর চোখ খোলে! এই এঁদো দেশে পড়ে থেকে কারও কিছু হওয়ার নয়।

এই মুহ্যমান অবস্থাতেও আমার যুক্তি-বুদ্ধিতে মনে হয়েছিল, ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে এই ভাবাবেগ কেটে যাবে। প্রথম বিদেশে গেলে এরকম তো সকলেরই হয়।

দিদি আমাকে পেয়ে আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বারবার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কত বড় হয়ে গেছিস!

জামাইবাবু অতি শান্ত ও সজ্জন মানুষ। বুদ্ধিমান ও বিবেচক।

আমার যে মন ভাল নেই সেটা বুঝে উইক এন্ডে বড় বড় ট্রিপে নানা বিস্ময়কর জিনিস ও দৃশ্য দেখাতে নিয়ে গেলেন। নানা দ্রব্যাদি কিনে-টিনে দিলেন। গাড়ি চালানো শেখার স্কুলে ভরতি হওয়া, কিছু ট্রেনিং এবং তারপর কাজে লেগে পড়তেও আমার খুব বেশি দেরি হয়নি।

ভেবেছিলাম দিদির কাছে এলেই আমার বাড়ি বা স্বদেশ বিরহ-দশা কেটে যাবে। কিন্তু বেচারা দিদি তার দুটো দুষ্টু বাচ্চাকে নিয়ে হিমশিম। তারপর রান্নাবান্না, কাপড় কাচা এবং চাকরি। দিদি বদলে যায়নি বটে, কিন্তু তার লাইফস্টাইল বিলকুল পালটে গেছে। কারও তেমন সময় নেই। রাতে খাওয়ার সময় যা একটু আধটু 'আড্ডা'। সকালে কাজে বেরোতে হয়। ফলে লেট নাইট করা অসুবিধেজনক।

আমেরিকার কুখ্যাত একাকিত্বের কঠিন সান্নিধ্য মাসখানেকের মধ্যেই টের পেয়ে গেলাম। আমাকে খানিকটা হাঁফ ছাড়ার অবকাশ দিয়েছিল সফটওয়্যার তৈরি করার নেশা। কিন্তু যাকে স্বস্তি বোধ করা বলে, 'অ্যাট হোম ফিলিং' সেটা আমার হল না কিছুতেই। একটা আড় আড় ভাব, একটু উড়ু উড়ু মন, বারবার আধোঘুমে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। প্রায় রোজ বাড়িতে ফোন করে অনেকক্ষণ কথা না বললে পাগল পাগল লাগে। দিদির লাইনের বিল উঠছে জেনেও কিছু করার ছিল না আমার। ফোন না করলে দম বন্ধ হয়ে আসে যে!

দু'বছর বাদে আমি বুঝে গেলাম, এভাবে সম্ভব নয়। এই অতি চমৎকার, সুশৃঙ্খল এবং বিচিত্র দেশে আমার শিকড়

প্রোথিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিউ জার্সির নাটলে শহরে একটা ছোট মিষ্টি বাড়ি, একটা মিৎসুবিসি গাড়ি কেনা হয়ে গেছে। বেশ ভদ্রগোছের একটা চাকরি করি। কিন্তু কোনও বন্ধনেই আমেরিকা আমাকে ঠিকমতো বেঁধে উঠতে পারল না। একদিন ঘুম ভেঙে মধ্যরাতে উঠে বিছানায় বসে আমি নিজের কাছেই ঘোষণা করলাম, আমি ফিরে যাব।

আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে দিদি প্রথমে প্রচণ্ড চেঁচামেচি করল, তারপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল, বলল, তোকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। কত কাঠখড় পুড়িয়ে আনালাম, আমি তা হলে কী নিয়ে থাকব? আমার কে আছে এখানে? এইসব নানা আবেগের কথা।

কিন্তু আমার শিষ্ট ও বিবেচক জামাইবাবু বললেন, শোনো, অত উতলা হোয়ো না। এ দেশ কিন্তু সকলের সয় না। ওকে আটকে রেখে কেন কষ্ট দেবে?

দিদি সজল চোখে বলল, ওরকম কি আমারও হয়নি? প্রথম প্রথম তো আমি কত কেঁদেছি। তোমাকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য কত তাড়না করেছি বলো!

সে তো ঠিক কথা। তবু তোমার কথা আলাদা। তখন আমার সঙ্গে তোমার জীবন জড়িয়ে গেছে। কাঁধে দায়-দায়িত্ব চেপেছে। আমাকে ফেলে যাওয়ার তো উপায় ছিল না তোমার। আরও একটা ব্যাপার ছিল। তখন তুমি আমেরিকানদের ইংরেজি বুঝতে পারতে না বলে এলিয়েনেটেড লাগত। কিন্তু স্পোকেন ইংলিশের কোর্স করার পর মানিয়ে নিতে তোমার অসুবিধে হয়নি। ঠিক কি না বলো? অলকের প্রবলেম কিন্তু অন্য।

কোনওদিন ওর মন এখানে বসবে না। আমেরিকার সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে অনেকেই কিন্তু দেশের অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও ফিরে যায় শেষ অবধি। তাদের সংখ্যা কম, কিন্তু এরকম লোক আমি বেশ কয়েকজনকে দেখেছি।

দিদি তবু বুঝতে চাইছিল না। আমি ওই লোভনীয় জীবন, সুন্দর একটা দেশ ছেড়ে কেন ফিরে যেতে চাইছি তা বস্তুত আমিও যুক্তি দিয়ে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শুধু টের পাই আমার ভিতরে একটা তাড়না পাখা ঝাপটাচ্ছে, তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না, হঠাৎ হঠাৎ বুকটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে! আর কিছুদিন থাকলে গ্রিনকার্ড এবং শেষে সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেসব আমার কাছে ছেলেবেলার খেলনার মতো অর্থহীন লাগে।

দেশের প্লেনে চেপে বসার পর বুক হালকা হল। গত দু'বছর যে-তাড়না আমাকে উদ্ব্যস্ত করেছে, তা উধাও। শুধু দিদিটার জন্য মনটা বড্ড ভার। এয়ারপোর্টেও লাজ-লজ্জা ভুলে খুব কেঁদেছে।

গোলোকবাবু যে আমাকে বিলেতফেরত বলে জানেন, তা এই জন্যই। তিনি সম্ভবত বিলেতফেরতের পুরনো মহিমাকেই বোঝেন। কথাটার ওজন যে কমে গেছে, সে খবর রাখেন না।

গোলোকবাবু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অতিশয় দুর্বল মানুষ। দারিদ্রসীমার রেখাটাকে যদি জলের উপরিভাগ বলে ধরা হয়, তা হলে গোলোকবিহারীর প্রায় সবটাই সেই জলে ডুবে আছে, শুধু নাকখানা তিনি অতি কষ্টে ভাসিয়ে রেখেছেন। আমার ইনকাম ট্যাক্সের উকিল গিরিজাশংকরকে তবু দয়ালুই বলতে

হবে। কারণ গোলোকবিহারী অন্তত বার তিনেক মক্কেলদের কাছ থেকে জরুরি কাগজপত্র আনতে গিয়ে সেগুলো হারিয়ে ফেলেছেন, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হিয়ারিং-এর নোটিস গিরিজাবাবুকে দিতে ভুলে গেছেন এবং একজন শাঁসালো মক্কেলের কাছে পুজোর বখশিশ চেয়ে গিরিজাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। তা ছাড়া দেরিতে অফিসে আসা, কামাই করা, এক কথা বারবার না বললে বুঝে উঠতে না পারা, এসব তো আছেই। গিরিজাশংকর তবু গত বিশ বছর ধরে গোলোকবাবুকে কাজে বহাল রেখেছেন, এটা তাঁর মহত্ত্ব বলেই ধরতে হবে।

গোলোকবিহারী মাঝে মাঝেই বিনা কাজে আমার অফিসঘরটিতে এসে কোণের দিকে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে থাকেন। কোলে তাঁর বহু পুরনো জীর্ণ ছেঁড়া জিপারখোলা ব্যাগ। বিবর্ণ ছাতাখানায় ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে বসে তিনি দিশাহীন চোখে চেয়ে কোন অশরীরীর সঙ্গে অবিরল কথা বলে যান কে জানে! তাঁকে অভ্যর্থনা বা আপ্যায়নের দরকার হয় না, এমনকী কথা না বললেও তিনি কিছু মনে করেন না। তাঁর যত কথা সব তো নিজের সঙ্গেই! বিড়বিড় করে কী যে বলে যান, তা শোনা যায় না। আমি নিবিষ্টমনে আমার কমপিউটারে কাজ করি, উনি ধৈর্য সহকারে বসে থাকেন। দু'ঘণ্টা পর পর মোড়ের চায়ের দোকান থেকে চা আসে। ভাঁড়ের চা-টুকু ভারী যত্ন করে খান। তখন একটু-আধটু কথা হয় বা হয়ও না। যেমন—

গোলোকবাবু, সাইকেল চালানোর সময় হঠাৎ বৃষ্টি এলে কি ছাতা খুলতে পারেন?

পারি।

এই খানাখন্দে ভরা রাস্তায়, বৃষ্টির মধ্যে, অন্ধকারে কী করে পারেন?

ওভ্যেস।

যে-লোকটা সাইকেল রেসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তাকে ডেকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে এ জিনিস সে পারবে কি না। চোখে ভারী চশমা নিয়ে, পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে, শরীরে অ্যাড্রিনালিন বা ভিটামিন বা প্রোটিন ছাড়া এবং আরও নানা অপুষ্টি নিয়ে, মনে অশান্তি ও উদ্বেগ নিয়ে, কোনও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে মান্ধাতার আমলের একটা লজ্‌ঝড়ে সাইকেলে? না, সে পারবে না। আমি জানি।

গোলোকবিহারীকে আমি কখনও লক্ষ করি, কখনও করি না। একজন গুরুত্বহীন, উপেক্ষণীয় এবং উপযোগহীন ব্যক্তি। কিন্তু আজ সন্ধেবেলা আমি এই লোকটার বিষয়ে ভাবছি। গোলোকবিহারীকে শাবলরাম জুতোপেটা করছিল, আর তার ফলে তাঁর ভিতরের রাগের ঘুমন্ত সাপটা হঠাৎ জেগে উঠে ফোঁস করল, মনে মনে উচ্চারিত হল অভিশাপ, আর সঙ্গে সঙ্গে তা ফলে গেল— ঠিক এইভাবেই যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে, তা হলে আমাদের মতো বস্তু ও যুক্তিবাদীদের কিছু মুশকিল হয়। শাবলরামের মৃত্যু দশ মিনিট আগে বা পরে ঘটলে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু এরকম অদ্ভুত টাইমিংটাই গোলমেলে। একজন রেগে গিয়ে আর একজনের মৃত্যুকামনা করতেই পারে। সেটা দোষের হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা বলে সেটা ফলে যাবে, এ আবার কেমন কথা!

চান্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটির সূত্রে এরকম ঘটনা কত লক্ষ বা

কত কোটির মধ্যে একটা ঘটতে পারে? ভেবে কোনও কূল বা কিনারা পাওয়া গেল না।

কমপিউটারে কাজ করতে করতে আজ আমি বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। গোলোকবিহারী আজ আমাকে ভাল এক ফ্যাসাদে ফেলে গেছেন। একটু দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগও হচ্ছে।

মধুপর্ণা

মন দিয়ে বাংলার নোট টুকছিলাম। এমন সময় পিকু এসে বলল, এই দিদি, কাপ্তান ছাঁট কাকে বলে জানিস?

কাপ্তান ছাঁট! নাহ্‌, জন্মে শুনিনি।

তুই কিচ্ছু জানিস না। কাপ্তান ছাঁট হল, ব্রহ্মতালুতে লম্বা লম্বা চুল থাকবে, কিন্তু ঘাড় উঁচু করে কামানো, জুলপি আর মাথার ধারের চুল খুব মিহি করে ছাঁটা। অনেকটা বাটি ছাঁটের মতো। কেমন দেখাবে বল তো?

এসব জেনে আমার কী হবে?

ঠিক নারকোল গাছের মতো।

কী! নারকোল গাছের মতো?

কাপ্তান ছাঁট দিলে মানুষকে নাকি নারকোল গাছের মতো দেখায়।

ভ্যাট, কোত্থেকে সব কিম্ভূত ছাঁটের গল্প শুনে এসেছে!

যা না, বাইরের বারান্দায় বসে শশীজ্যাঠা বাবাকে কাপ্তান

ছাঁট বোঝাচ্ছে। আগে নাকি কাপ্তান ছাঁট ছিল দারুণ স্টাইল। তুই এরকম একটা মুখ এঁকে দিতে পারবি?

এখন যা তো, কাজ করছি দেখছিস না!

দে না এঁকে দিদি, বন্ধুদের দেখাব। তুই যা আঁকিস! দারুণ!

ড্রইং খাতাটা টেনে একটু ভেবে একটা মুখ আঁকলাম। কাপ্তান স্টাইল কখনও দেখিনি, তবু আন্দাজে স্কেচটা করে দিয়ে বললাম, এইরকম?

পিকু ঝুঁকে একমনে আঁকা দেখছিল। একটা বিশাল শ্বাস টেনে বলল, বাপ রে! কী দারুণ হয়েছে রে মুখটা! দে তো পাতাটা, বন্ধুদের দেখাব।

বলে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে এক ছুটে চলে গেল।

মা ডাকছিল। মেয়েদের এই এক জ্বালা। আপনমনে কিছুক্ষণ নিজের কাজ নিয়ে থাকার জো নেই। সংসারে হরেক ফরমাশ তার ওপর এসে চাপে। জানি, এখন চা নিয়ে বাইরের বারান্দায় পৌঁছে দিতে হবে। দেরি হলে কট কট করে কথা শোনাবে মা। মেয়েদের ওপর মায়েদের যত আক্রোশ।

সুদেষ্ণা তার নোটগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। হাতে আর তেমন সময় নেই। কিন্তু সেসব কথা কে শোনে! নোটগুলো জেরক্স করে নেওয়া যায়, কিন্তু গোকুলবাবুর জেরক্স মেশিনে কপি বড্ড আবছা উঠছে আজকাল। বাজারের কাছে কালিদাসের জেরক্স মেশিনেই কপি করাতে নিয়ে যেতে হবে। তবে সেটা বেশ দূর।

কী মা?

আমাদের বাড়ি থেকে যখন বাবার জন্য মাকে দেখতে

যাওয়া হয়েছিল, তখন পাত্রী দেখে দাদু মন্তব্য করেছিল, মন্দ না। ট্যাপাটোপা আছে।

অনেক শব্দের মানে ডিকশনারিতে নেই। তাতে কী? শব্দটা শুনলেই বুঝতে পারি ট্যাপাটোপা মানে হচ্ছে গোলগাল, নেপচু, একটু বেঁটে, গোলাকৃতি মুখ। আমার মা অবিকল তাই। ট্যাপাটোপা। শব্দটা যেন মায়ের জন্যই সৃষ্টি।

সারাদিনে মায়ের নানারকম রূপ। সকালের দিকটাই একটু বিপজ্জনক। মুখ গোমড়া এবং রাগ রাগ। ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে থমকে আছে ধমক। এই সময়টায় ঝি আসে, ঝাড়ুদার আসে, ভিখিরি আসে। চায়ের ফরমাশ হয়, অফিসের আর স্কুল-কলেজের ভাতের তাড়া থাকে। তবে আজ রবিবার বলে মুখটা ততটা তোম্বাপানা নয়। তা হলেও বেশ থমথমে।

দয়া করে চা-টা দিয়ে এসো। ট্রে-টা দু'হাতে ধরো, হাতে পায়ে তো লক্ষ্মী, ফেলে ভেঙো না। দামি কাপডিশ।

এই বাড়তি কথাগুলোর দরকার ছিল না। সে বোধহয় মাস দুয়েক আগে মদনকাকা আর বন্দনা কাকিমাকে চা দিতে গিয়ে ঘরের পর্দা উড়ে এসে একটা কাপ ঝটকা মেরে ফেলে ভেঙে দিয়েছিল. তার জন্য। দোষটা পুরো আমারও নয়। সেই ঘটনাটা কতবার যে আমাকে মনে করানো হয়!

শশী লাহিড়িকে আমরা জ্যাঠামশাই বলে ডাকি বটে, কিন্তু উনি বয়সে আমার দাদুর চেয়েও বড়। একাশি-বিরাশি বলে শুনেছি। আর আমার বাবার বয়স মাত্র আটচল্লিশ। শশীজেঠুর পরিবার ব্রিটিশ আমলে কী সব স্বাধীনতা সংগ্রাম-টংগ্রাম করেছেন। আমি অবশ্য ব্যাপারটা ভাল বুঝি না। আমার

বাবারও তখন জন্ম হয়নি। তবে লাহিড়ি-বুড়োকে সবাই বেশ খাতির-টাতির করে।

ট্রে-র ওপর দু'কাপ চা আর একটা ছোট কাচের বাটিতে মুড়ি। শশীজেঠু মুড়ি ছাড়া চা খায় না, তাও আবার মুড়িটুকু চায়ের কাপে ঢেলে। কী অদ্ভুত চা খাওয়া রে বাবা!

চা নিয়ে সামনের টুলে রাখতেই শশীজেঠু কথা থামিয়ে বলল, হ্যাঁরে বুলি, তুই নাকি ভাল কবিতা লিখিস?

কে বলেছে তোমাকে?

ওই তো আমার ভাইঝি টুসকি বলছিল। কোথায় নাকি বেরিয়েছে তোর কবিতা। সেই কাগজটাও দেখাল, কোরক না কী যেন নাম।

বাবা আগ বাড়িয়ে বলল, ও তো কোরকে প্রায়ই লেখে। কলেজ ম্যাগাজিনে, অজিতবাবুর অবুঝপত্রে, তারপর শ্যামলিমায়, কত কাগজেই তো বেরোয়।

এতদিন বলিসনি তো!

আমি বললাম, ওই শখ করে লিখি। তেমন কিছু নয়।

আহা, ব্যাপারটা উড়িয়ে দিচ্ছিস কেন? ক্রিয়েটিভ কাজ করা খুব ভাল। শুধু চাকরিমনস্ক হওয়া মোটেই কাজের কথা নয়।

বাবা বলল, ভীষণ ভাল ছবিও আঁকে। 'বসে আঁকো'-তে কত প্রাইজ পেয়েছে!

তাই নাকি রে বুলি? কী আঁকিস তুই? সিন-সিনারি নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে বলি, হিজিবিজি এঁকে যাই। কী হয় কে জানে!

তবে তো তুই বেশ গুণের মেয়ে। এসব গুণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য

করিস না যেন। যা হোক একটা কিছুতে যদি ধ্যান দিতে পারিস, তা হলে জীবনে একটা জানলা খোলা থাকবে খোলা বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য। কেউ কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ করছে জানলেই আমার ভীষণ ভাল লাগে।

আমিও তো ওর মাকে তাই বলি। ওর যা ভাল লাগে তাই করুক। কিন্তু ওর মা ওকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্য অস্থির...

এইবার আমি পালিয়ে আসি। মেয়ের কথা উঠলে বাবার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এখন সাতকাহন করে আমার গুণের কথা জেঠুকে শোনাবে। বাবাটা যেন কী!

মায়ের ফুলমাসি ডাক্তার। আর ওই মাসিই হল মায়ের হিরো। কথায় কথায় ফুলমাসির উদাহরণ টেনে আনবে মা। আমাকেও ওই ফুলমাসির ছাঁচে ডাক্তার করাবে বলে উঠেপড়ে লেগেছিল। কপাল খারাপই বলতে হবে, আমি মাধ্যমিকে স্টার পাওয়ার পর মায়ের জোরাজুরিতে সায়েন্স গ্রুপে ভরতি হতে হল। বোধহয় আমার মেধা তত খারাপ নয়। সায়েন্স পড়তে ভাল না লাগলেও হায়ার সেকেন্ডারিতে বেশ ভাল রেজাল্ট করে ফেলেছিলাম। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে মেডিক্যালে চান্স পেলাম বাঁকুড়ায়। কিন্তু তারপরই বেঁকে বসলাম। আমার ডাক্তারি পড়ার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার ভাল লাগে সাহিত্য। আমার ভাল লাগে সংস্কৃত বা ইতিহাস। আমি কোন দুঃখে রোগভোগের জগতে গিয়ে ঢুকব? এই দ্বৈরথ লড়াইয়ে মা ভার্সেস আমি। তাতে নির্ঘাত আমারই পরাজয় ঘটত। কিন্তু মায়ের কাছে বরাবর যে-লোকটা কাপুরুষ হয়ে যায়, সেই বাবা হঠাৎ আমার পক্ষ নিয়ে সিংহনাদ ছাড়তে লাগল। আর

বাবার জন্যই শেষ অবধি পিছু হটতে হল মাকে। অবশ্য বিস্তর অশান্তির পর।

আমি বাংলা অনার্স নিয়ে কলেজে ভরতি হওয়ার পর কিন্তু অনেকেই প্রকাশ্যে আফসোস বা বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। সায়েন্সে এত নম্বর পেয়ে, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পেয়ে কেউ বাংলা অনার্স পড়তে আসে? পাগল নাকি তুমি? এই দলে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। হয়তো আমি একটু পাগলই। কিন্তু কেন আমাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আইআইটি-শিয়ান বা ইকনমিস্ট হতেই হবে, এটা কেউ আমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। আমি কবিতা লিখলে, ছবি আঁকলে বা ফিল্ম বানালে কী এমন ক্ষতি হবে, তাও বুঝি না বাবা! কে কত কামায়, কে বিদেশে যায় বা কে কোন পোস্টে চাকরি করছে, এখন সেটাই সকলের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আমি যদি কিছু একটা করে আনন্দে থাকি বা তৃপ্তি পাই, সেটাকে কেউ গুরুত্বই দেবে না!

ক্লাস টু থেকে এই শহরের সব 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় আমি একচ্ছত্র ফার্স্ট হয়ে আসছি। হয়তো তেমন দামি প্রাইজ কিছুই নয়, ক্রেয়নের বাক্স, রঙের সেট, স্কুলব্যাগ এইসব গাদা গাদা জমা হয়েছে বাড়িতে। ছেলেদের স্কুলে কিছুদিনের জন্য একজন ভাল ড্রইং টিচার এসেছিলেন। সমীর বসু। আর্ট কলেজের পাশ করা শিল্পী। তিনি আমাকে অল্পদিনেই অনেক কৌশল শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই একদিন বড় আর্টিস্ট হবে। আঁকা ছেড়ো না। সমীরদা পরে শান্তিনিকেতনে চলে যান। এখন আমি আর 'বসে আঁকো'-তে প্রতিযোগী হিসেবে যাই না, মাঝে মাঝে বিচারক হয়ে যেতে হয়। তার

চেয়েও বড় কথা, ছবি আঁকতে বললে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন মগ্ন আনন্দে থাকা যায় যে, সেরকম আনন্দ পৃথিবীতে কমই আছে। এসব কেন যে লোকে কিছুতেই বুঝতে চায় না, সেটাই আশ্চর্যের।

সেই থেকে আমার প্রতি মায়ের ব্যবহারও একটু অন্যরকম হয়েছে। একটু রাগ-রাগ ভাব। প্রায়ই হা-হুতাশ, পাড়াপড়শির কাছে কাঁদুনি গাওয়া তো আছেই। এমনকী মা আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে আপদ বিদেয় করার জন্য গত বছর এক পাত্রও জুটিয়ে ফেলেছিল। একটা রাক্ষুসে বড় কোম্পানির নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেটর বা ওই ধরনের কিছু। চাকরির মাথামুন্ডু আমরা কিছুই বুঝিনি, শুধু জানা গিয়েছিল তার মাস মাইনে এক লাখ টাকারও বেশি এবং সে প্রায়ই বিদেশে যায়। সুতরাং ফ্যালনা পাত্র নয়। কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছিল না যে, বিয়েটাই আমার জীবনের সব কিছুর সমাধান বা লক্ষ্যমাত্রা নয়। আর টাকাটাও পাত্রাপাত্র বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। সুতরাং ফের ঝগড়া, অশান্তি, মায়ের গৃহত্যাগের হুমকি।

অবশেষে বিয়ে রদ করা গেল বটে, কিন্তু সেই থেকেই মা আর মেয়ের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে। এখন চলছে ঠান্ডা লড়াই। আমাকে ছেড়ে মা এখন পিকুকে নিয়ে পড়েছে। পিকুর বয়স মাত্র তেরো বছর। তার অবশ্য ডাক্তার হতে কোনও আপত্তি নেই। তবে সেইসঙ্গে মারাদোনা এবং সচিন তেন্ডুলকরও হতে চায় সে। আবার সোনু নিগমের মতো গায়ক বা শাহরুখ খানের মতো অভিনেতা হওয়ারও তার প্রবল

ইচ্ছে। আর সব ক'টা একসঙ্গে হতে পারলে তো কথাই নেই। তবে এখন আর সে আগের মতো স্পাইডারম্যান হওয়ার চেষ্টা করছে না. সেটাই যা রক্ষে। স্পাইডারম্যান হতে গিয়ে একবার দড়ির ফাঁসে আটকে যা বিপত্তি ঘটেছিল! আসল কথা হল, মায়ের মনোযোগ এখন পিকুতে নিবদ্ধ হয়েছে। আমি বাংলা অনার্স পড়ি। সুতরাং আমার অস্তিত্ব মা'র কাছে অর্থহীন। একটা মেয়ে বাড়িতে আছে, এই পর্যন্ত। একদিক দিয়ে এই অবস্থানটা আমার ভাল না লাগলেও, নিরাপদ লাগে। আমি নিজের মনের মতো কাজ নিয়ে থাকতে পারি। আর সত্যি কথা বলতে কী, ছবি এঁকে, কবিতা লিখে আমি ছোট ঘরটিতে একটা জগৎ রচনা করে নিয়েছি।

আমার বিষয়ী মেজমামা এসে একদিন জিজ্ঞেস করল, কেরিয়ারটার তো বারোটা বাজালি, অনার্সে কি ফার্স্ট ক্লাস পাবি?

কী করে বলব? জানি না তো!

ফার্স্ট ক্লাস পেলেও লাভ নেই। বড়জোর কোনও কলেজে প্রফেসারি। তুই তো ছবিও নাকি দারুণ আঁকিস!

দারুণ কি না জানি না। তবে আঁকি।

তা হলে আর্ট কলেজে ভরতি হয়ে যা, ওইটাই কেরিয়ার কর। ছবি আঁকায় আজকাল কাঁচা পয়সা। গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরীর ছবি এখন লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয়, তা জানিস?

আবার আমি ভারী অস্বস্তিতে পড়ে যাই। মামাকে কী করে বোঝানো যাবে যে, আমি মোটেই অধ্যাপনার লক্ষ্যে তৈরি

হচ্ছি না বা ছবি বিক্রির লাখ লাখ টাকার কোনও স্বপ্নই আমার নেই। আমি ছোট ছোট এইসব প্রিয় উৎস থেকে, মৌমাছি যেমন মধু তুলে আনে, তেমনি আমার আনন্দকে তুলে আনি। তার বেশি কিছু নয়।

যতই কথা হোক না কেন যে, মানুষের রূপের গভীরতা চামড়া পর্যন্ত, তার বেশি নয়। তবু শেষ অবধি রূপটাও একটা মস্ত ফ্যাক্টর। বিশেষ করে মেয়েদের। শতেক গুণপনা থাক, তবু একটা মেয়ের দেহের সৌন্দর্য নিয়ে পৃথিবী পাগল। আর সেই জন্যই আমার রূপের কথাটাও একটু বলে নেওয়া দরকার। মুশকিল হল, আমি নিজেকে দেখতে পাই না। আয়নায় যখন নিজেকে দেখি, তখন যেহেতু আমি নিজেকে দেখছি তাই আমি পক্ষপাতদুষ্ট এবং আমার প্রয়োজনীয় ডিটাচমেন্ট নেই। সুতরাং মানুষ, সে যত সুন্দর বা কুচ্ছিতই হোক, নিজেকে ঠিকঠাক সমীক্ষা করতে পারে না। তবে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমি আমার মায়ের মতো পাঁচ ফুটিয়া নই। আমার বাবার লম্বাটে গড়ন পেয়েছি বলে আমি পাঁচ ফুট সাড়ে তিন— ঢ্যাঙা নই, বেঁটেও নই। আমার মা ফরসা, বাবা তামাটে। আমি মিলিজুলি তামাটে। কেউ আমাকে ফরসাও বলবে না, কালোও নয়। এটুকু নিজের থেকেই বলা যায়, কারণ এ হল স্ট্যাটিসটিক্স। কিন্তু সৌন্দর্য জিনিসটা স্ট্যাটিসটিক্সের বাইরে।

অনার্স ক্লাসে একদিন প্রফেসর শান্তিবাবু আমার খোঁজ করতে গিয়ে বলেছিলেন, আরে ওই যে মেয়েটা, যার কপালটা ছোট আর মাথায় অনেক চুল...

এক প্রবল বৃষ্টির দিনে আমরা কলেজে আটকা পড়ে

গিয়েছিলাম। বাংলা অনার্সে আমরা অনেক ছাত্রছাত্রী। বেশ কয়েকজন, যাদের ছাতা ছিল তারা একজন-দু'জন করে চলে গেলেও, আমরা বেশ কয়েকজন বেরোতে পারিনি। দু'-তিনটে দলে ভাগ হয়ে ক্লাসরুমেই আড্ডা দিচ্ছিলাম। তখন কথায় কথায় চেহারার কথাও হচ্ছিল ইয়ারকি করে। মৃদুল এক নম্বরের ফাজিল। আমাকে বলল, তোর মুখে অনেক ডিফেক্ট আছে ঠিকই, তবে তোর ঘাড়টা কিন্তু রিয়েল গ্রীবা। জিরাফের পরই তুই।

আমার বন্ধু বন্দনা প্রায়ই বলে, এই তুই আমার দিকে একদম সোজা চোখে তাকিয়ে কথা বলবি না তো। তোর বড্ড জুলজুলে চোখ, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করে।

আর একটা মত দিয়েছিল অনিমেষ। অনিমেষ ভীষণ বোকা, তবে ভাল মানুষ। আমরা এক পাড়ার এবং ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুর মতো। তার মতে, বুঝলি বুলি, তোকে একবারে দেখে তেমন কিছু বোঝা যায় না। বার তিনেক তাকালে তবে বোঝা যায় তোর মুখে বেশ বুদ্ধিশুদ্ধির ছাপ আছে। এইসব নানা মতামত জড়ো করলে এবং খানিকটা ডেটা অ্যানালিসিসের পর এইরকম একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা যেতে পারে যে, আমি মোটেই সুন্দরী নই, হ্যাক ছিঃ-ও নই। দ্রষ্টব্য নই, তবে উপেক্ষার মানুষও নই। কথাটা দাঁড়াল, আমি নিতান্তই মাঝারি। অর্থাৎ র‍্যাম্পে হাঁটার কোনও চান্স নেই।

খুব সাদামাটা সাজি বলে আমার ওপর বন্ধুদের একটু ক্ষোভ আছে। কেউ কেউ বকুনিও দেয়। তোর কি সাজগোজের ব্যাপারে কমপ্লেক্স আছে, নাকি বাড়ির লোক পছন্দ করে না?

না রে, ওসব নয়। বিয়েবাড়ি যাওয়ার সময় একটু সাজতে গিয়েই দেখেছি কেমন আড়ষ্ট লাগে। পুতুল-পুতুল মনে হয়।

যাঃ মুখপুড়ি, ও আবার কী কথা! শুধু জবরজং সাজার কথা তো বলা হচ্ছে না, কিন্তু একটু কালারফুল তো থাকবি! সাজিস না বলেই তোকে সবসময় মেলানকলিক লাগে। সাজগোজেরও একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে, তা জানিস?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পাত্রপক্ষরা কিন্তু আমার জন্য বেশ হামলে পড়ছে এবং কেউই অপছন্দ করছে না। এই তো মাস দুয়েক আগে একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে মা আঁশটে মুখ করে ঘোষণা করল, সামনের রোববার এক পাত্রপক্ষ বুলিকে দেখতে আসছে।

বাবা অবাক হয়ে বলল, সে কী! বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ তারা আসবে কেন? এটা তো ভীষণ জুলুম হয়ে যাচ্ছে!

মা ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলল, আগে শোনো, পাত্রপক্ষকে আমি ডাকিনি, তাদের আমি চিনিও না। তারাই ফোন করে কাকুতি-মিনতি করে বলেছে, মেয়েটির কথা একজনের কাছে শুনে তারা ভীষণ মুগ্ধ। কোনও ফর্মালিটির ব্যাপার নয়, শুধু এসে একটু কথা বলে যেতে চায়। বিয়ের জন্য চাপাচাপি নেই।

কিন্তু তারা কারা?

ভদ্রলোকের নাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বর্ধমানে দু'-দুটো হিমঘর আছে। কয়েক কোটি টাকার ব্যাবসা। এখন তোমরা বুঝে দেখো রিফিউজ করবে কি না।

বাবার রুখে ওঠা ভাবটা হঠাৎ মিইয়ে গেল। আমতা

আমতা করে বলল, শুধু পয়সা হলেই তো হবে না। ছেলের কোয়ালিফিকেশন কী?

দিল্লি থেকে এমবিএ পাশ করা। বাপের সঙ্গেই ব্যাবসা দেখে।

তাই তো! এ যে বেজায় ভাল পাত্র দেখছি! কী বলিস রে বুলি?

আমি কাঠ কাঠ গলায় বললাম, এখন বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

মা বলল, তারা সে কথাও বলেছে। এখন বিয়েতে রাজি না হলেও ক্ষতি নেই। ছেলের বয়স মাত্র আঠাশ বছর। দু'-চার বছর অপেক্ষা করতেও তারা রাজি।

বাবা চিন্তিত হয়ে বলে, কিন্তু বুলির খবরটা তাদের দিল কে? আমাদের চেনা জানা কেউ নিশ্চয়ই!

সেটা তারা বলেনি। এখন বাপ-মেয়েতে মিলে পরামর্শ করে দেখো রবিবার মেয়ে তাদের সামনে যেতে রাজি হবে কি না। আমি তো এ বাড়ির কেউ নই, কাজেই আমার মতামতের কোনও দাম নেই। যদি রাজি না থাকো তা হলে ফোন নম্বর দিচ্ছি, ফোন করে আসতে বারণ করে দিয়ো।

মায়ের এই দৃপ্ত ঘোষণার পর বাবা আর আমি বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলাম। পিকু চুপচাপ শুনছিল, এবার হঠাৎ বলল, আরে দিদি, লোকটা তো হেভি বড়লোক আছে। বিয়ে করলে গাড়ি চড়ে খুব ঘুরতে পারবি।

এর আগে লাখ টাকা বেতনের যে-পাত্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল, তারা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে আসেনি।

এক বিকেলে কয়েকজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছিলেন। আমি চা-টা করে দিয়েছিলাম। তখন জানতামও না যে, ওরা পাত্রপক্ষ এবং আমাকে লক্ষ করছে। আমার সাজগোজও কিছু ছিল না, শুধু রোজকার মতো বিকেলে চুল বেঁধেছিলাম আর কপালে খয়েরি টিপ ছিল। তাইতেই তারা নাকি ভীষণ ইমপ্রেসড!

যাই হোক, বাবা আমাকে বলল, তোর আপত্তি না থাকলে ওদের বারণ করার দরকার নেই, কী বলিস?

আমি একটু ভাবলাম, বিয়ে করব না বলে আমার কোনও ধনুকভাঙা পণ নেই। বরং ভবিষ্যতে আমি একজন হৃদয়বান মানুষের ঘরনি হওয়ার কথাই ভাবি। আর কেন জানি না, দু'-তিনটে বাচ্চার মা হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে হয় আমার। বাচ্চাদের আমি ভীষণ ভালবাসি। পিকু যখন ছোট ছিল, তখন সারাদিন ওকে নিয়েই আমার কেটে যেত। কী সুন্দর স্বর্গীয় গন্ধ ছিল ওর মুখে! বাবাকে বললাম, আমি কিন্তু সাজগোজ করে সং সেজে ওদের সামনে যেতে পারব না। আর পাত্রীকে যেসব প্রশ্ন-ট্রশ্ন করা হয়, তা করলে কিন্তু...

বাবা বলল, আরে না, সেরকম সম্ভাবনা দেখলে আমিই আপত্তি করব।

তারা বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ খুব দামি একটা বড় গাড়িতে করে রবিবার সন্ধের সময়ে এসে হাজির হল। বেশ ফরসা-টরসা, বড়সড় চেহারা। মেয়েদের গায়ে অনেক গয়না-টয়না, পরনে বেনারসি। আমাদের সাদামাটা বসার ঘরখানা বেশ আলো হয়ে গেল। হ্যাঁ, এরা বড়লোক বটে!

এবং বেশ ভদ্র আর বিনয়ী। তিনজন মহিলা ড্যাব ড্যাব করে আমাকে দেখছিল, চারজন পুরুষ আড়ে আড়ে। তবে আমি বেশিক্ষণ তাদের সামনে থাকিওনি। আমার কোনও উত্তেজনা নেই, প্রত্যাশা নেই, লজ্জা-টজ্জা হচ্ছে না, বুক কাঁপছে না। খুবই স্বাভাবিক। অল্পবয়সি লালটু মার্কা পায়জামা আর মুগার পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলে ছিল দলে। বুঝলাম সেই পাত্র। কোনও কমপ্লেক্স নেই বলে পাত্র জেনেও আমি তার চোখে চোখ রেখে বেশ কটমট করে কয়েকবার তাকিয়েছি। দেখলাম ভয় পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

ছেলের বাবা শেষে হাতজোড় করে বাবাকে বলল, আপনার মেয়েকে কী বলব, আমাদের বড্ড মনে ধরে গেছে। একটু বলে কয়ে দেখবেন যদি বিয়েতে মতটা দেয়। আমাদের পয়সা আছে বলে ভাববেন না দেমাকি মানুষ। আমরা ভারী সাদামাটা, বাড়িতে রাধাগোবিন্দজিউর মন্দির আছে, মাথার ওপর গুরুদেব আছেন। আমরা ধর্মভীরু মানুষ, একটু ভেবে দেখবেন।

ভেবে দেখার কিছু ছিল না। এদের অনেক টাকা, এরা মানুষও ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু আমার মুশকিল হল. এসব শুনে এবং জেনেও আমার ভিতরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। একটা কিছু তো হবে! একটু বুকের দুরদুরুনি পর্যন্ত নেই। এত টাকা দিয়েই বা আমি কী করব ভেবে পাই না। বেশি করে ভাল-মন্দ খাব, আরও গয়না কিনব, শাড়ি কিনব, বড় বাড়িতে থাকব, ঝি-চাকর সেবা করবে, এসব ভাবতেই যে আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগে। পাখি-দম্পতি একটা একটা করে

খড়কুটো ঠোঁটে করে নিয়ে আসে, কত যত্ন করে নীড় বানায়, তারপর ডিম পাড়ে। ওই রচনাটুকুও এর মধ্যে থাকবে না। একটি কুলি আর কামিন যেমন ইট বয়ে নিয়ে আসে, মশলা দিয়ে ইট পাথর গেঁথে কাঁচা হাতে ঘর রচনা করে, তেমন কিছু তো হবে না। তা হলে কেমন হবে?

মা অবশ্য ভীষণ চেঁচামেচি করল, বাবারও মনটা বোধহয় খারাপ। কিন্তু আমি শুধু বললাম, আমার কিছু করার নেই।

আমি গার্লস স্কুলে পড়তাম। সে একরকম ছিল। কিন্তু কলেজে কো-এডুকেশন। এখানেই একটা মুশকিল। ছেলেরা ইউনিয়ন করে, মারপিট হয়, ক্লাস ভন্ডুল হয়, ইউনিয়নের ভোটের দিন তো রক্তারক্তি কাণ্ড। এসব আমার একটুও ভাল লাগে না। ক্লাসমেট ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা তুই-তোকারি হয় বটে, কিন্তু ছেলেদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার ফলে সারা কলেজেই একটা পুরুষালি গন্ধ। এমন নয় যে আমি মেয়েদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করি, তবু শুধু মেয়েরা যেখানে পড়ে সেখানে একটা নরম বাতাবরণ থাকে। এখানে তা নয়। একটু হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি বেশিই হয় এখানে। পুরুষ আর মেয়েতে যে তফাত, সেটা এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। আবহমান কাল ধরেই মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে, অথচ এককে ছাড়া অন্যের চলে না। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিও অন্তহীন। সমান্তরাল দু'টি রেখা দিগন্ত পার হয়ে অনন্তে মিশে গেলেও ওই পার্থক্যটুকু বুঝি ঘোচার নয়।

তাকে সবাই জিজি বলে ডাকে। জিজির চেহারাটা পাঠানসুলভ। চৌকো মুখ, প্রচণ্ড শক্তিমান দুটো কাঁধ, অ্যাই চওড়া কবজির হাড়, মাথায় ঘন চুল, মোটা গোঁফ, জোড়া ঘন

ভ্রূ, বুকখোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে রোমশ বুক দেখা যায়। মস্ত একটা মোটরবাইক চালিয়ে কলেজে আসে। ফাইনাল ইয়ার ইকনমিক্স অনার্সের উজ্জ্বল ছাত্র। আর তার জন্য মেয়েরা পাগল। জিজির একটা বন্য সৌন্দর্য এবং পুরুষালি আকর্ষণ আছে। যেখানে জিজি সেখানেই মেয়েদের ভিড়। আমি জিজির দিকে তেমন তাকাই না, ইচ্ছেও হয় না। সব মেয়ে যার জন্য পাগল সে আমাকে কেন আকর্ষণ করে না, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। শুধু জানি, এ ধরনের পুরুষরা বড্ড আত্মসচেতন আর হয়তো বেশ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। আর বোধহয় সূক্ষ্মভাবে নিজের পৌরুষকে জাহির করার চেষ্টা করে। একটু কৃত্রিম কি? হবেও বা। জিজিকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই আমার। আমার খাতায় জিজির নম্বর শূন্য।

কিন্তু কে জানত যে, কলেজ ভরতি এত সুন্দরী, সুবেশা, স্মার্ট মেয়ে থাকতেও জিজির খাতায় আমার মতো অতি মাঝারি একটা মেয়ের নম্বর চড়চড় করে বাড়ছে!

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মোটরবাইকটা ভোঁ ভোঁ করে আমার পাশাপাশি চলে এসে থামল।

তোমার নাম মধুপর্ণা না?

হ্যাঁ। বলে একটু হাসলাম।

তোমার সঙ্গে তো আলাপই হয়নি!

যেন আলাপ হওয়ার কথাই ছিল। কী বলব, আমার তো ওকে কিছু বলার নেই। ভদ্রতার হাসি হাসতে হল।

উঠে পড়ো। বলে জিজি তার বাইকের পিছনের সিটটা দেখাল।

উঠে পড়ব! কেন উঠে পড়ব, তা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বললাম, কেন?

আরে, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি!

আমি ব্যাপারটাকে ভীষণ অপমানজনক মনে করে জিজির চোখের দিকে সটান তাকিয়ে বললাম, কেন পৌঁছে দিতে চাইছেন? আমি তো রোজ এইভাবেই ফিরি। আজ অন্যভাবে কেন?

জিজি এই জবাবটা আশা করেনি। অনেক মেয়ে মোটরবাইকে উঠতে ভয় পায়, বলে 'পড়ে যাব' বা 'কখনও উঠিনি তো' গোছের কিছু। আমি কিন্তু তা বলিনি। পালটা প্রশ্ন করেছি। জিজির পৌরুষে ঘা লাগার কথা এবং রি-অ্যাক্ট করার কথাও। কিন্তু আমার দিকে রাগ আর অপমানে গনগনে চোখে তাকানোর বদলে হঠাৎ দেখলাম জিজি যেন কেমন ঘাবড়ে বিহ্বল হয়ে গেল। একটু যেন কুঁকড়েও গেল সে। টক করে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, ওঃ সরি, কিছু মনে কোরো না।

তারপর ঝড়ের বেগে বাইকটা চালিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পরদিন পরমা এসে পিরিয়ডের ফাঁকে আমাকে করিডরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, কাল তোকে জিজি লিফ্‌ট দিতে চেয়েছিল?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ।

তুই রিফিউজ করেছিস?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক বোধহয় ইনসাল্টেড ফিল করেছেন, তাই না?

পরমা কিছুক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, না।

যতটা ইনসাল্ট ফিল করেছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে ভয়।

ভয়! দুর, ভয় পাবে কেন?

কেন পাবে সেটা অন্য কথা। আমরা তো তোকে ভয় পাইনি, পেয়েছে জিজি। বলেছে মেয়েটার চোখে একটা কিছু আছে, গা হিম করে দিতে পারে। খুব সাংঘাতিক মেয়ে।

যাঃ, সব বানিয়ে বলছিস।

মা কালীর দিব্যি।

আমি খুব ক্যাজুয়ালি বললাম. চোখে কী আছে তা বলতে পারব না। তবে আমি যে-কোনও পুরুষের চোখের দিকেই সরাসরি তাকাতে পারি। আমার ভয় বা লজ্জা হয় না, কোনও কমপ্লেক্সও কাজ করে না।

হ্যাঁরে, তুই কি—?

না আমি লেসবিয়ান নই।

এরপরও জিজি অর্থাৎ গৌরগোপালকে নিয়মিত মহিলা পরিবৃত হয়ে দেখা যায় বটে, কিন্তু আমার দিকে আর কখনও তাকায়ও না।

কিন্তু শহরে তো জিজি একটা নয়, অনেক জিজি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও মোটরবাইক বা গাড়ি আছে, কারও হয়তো নেই, কারও চেহারা বা গ্ল্যামার বা ক্যারিশমা আছে, কারও হয়তো নেই। কিন্তু সরু নজরে মেয়েদের তাক করতে করতে নানা ছলাকলা বা অছিলায় তারা কেবলই কাছ ঘেঁষে আসতে চায়। আর স্তুতি বা স্তাবকতায় কোন মেয়ে একটু-আধটু বশ না মানে! আমাদের ক্লাসের বেশির ভাগ মেয়েরই ছেলে-বন্ধু জুটে গেল বছর না গড়াতেই।

একদিন নন্দন নামে একজন সিনিয়র ছেলে কলেজের মাঠে বসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। নন্দন বড়মানুষের ছেলে, দারুণ চৌকস, চোখে মুখে স্মার্টনেসের ঝলক, ইতিমধ্যেই জার্মানি-টার্মানি ঘুরে এসেছে।- সে বিদেশে ব্যাঙের মাংস খাওয়ার গল্প করছিল। কে যেন ঘেন্না পেয়ে ছোট্ট করে একটা ওয়াক তোলায় নন্দন বলল, ব্যাঙের মাংস খেলে বুঝবে কী জিনিস। জানো তো ব্যাঙের পা দেখতে ভারী সুন্দর, একদম ব্যালেরিনার পায়ের মতো। আমার কী হল কে জানে, আলটপকা বলে ফেললাম, তা হলে কি ব্যালেরিনার পা দেখলে আপনার কামড়াতে ইচ্ছে করে? একথায় সবাই ভীষণ হেসে ওঠায় নন্দন প্রচণ্ড অপমানবোধ করে উঠে গেল। আড়ালে নাকি বলেছে, আমাকে দেখে নেবে।

কী দেখবে তা কে জানে! হয়তো অ্যাসিড-বাল্‌ব ছুড়ে মারবে বা জোর করে ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করবে। মেয়েরা তো সব সময়েই সফ্‌ট টার্গেট। তা বলে আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় হল না। নন্দন একটু গুন্ডা গোছের ছেলে জেনেও হল না। কোনও ছেলেকেই আমার ভয় হয় না, প্রণয়ভিক্ষু কৃপাপ্রার্থী ছেলেদের তো আরও নয়। কথাটা বলছি এই কারণেই যে, সেদিন অত মেয়ের মধ্যে নন্দনের আসল লক্ষ্য কে ছিল তা আমি জানতাম। আমি ওসব টের পাই। আর তার পছন্দের মেয়েটিই তাকে এমন হাস্যাস্পদ করে তোলায় তার ইগো চোট খেয়েছে।

কিন্তু এইসব ছোটখাটো ঘটনা থেকে একটা কথা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যেতে লাগল। আমার আড়ালে বলাবলি হতে লাগল

যে, আমি ভীষণ অহংকারী। আমার খুব দেমাক। এই প্রচারটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা আমি মোটেই অহংকারী নই। নিজেকে নিয়ে আমি তো তত ভাবি না। আমার প্রিয় ভাবনা-চিন্তা কবিতা বা ছবিকে ঘিরে। কিংবা গান। নিজেকে জাহির করতে আমি একটুও পছন্দ করি না। কিন্তু আমাকে অহংকারী জানলে লোকে বোধহয় আমার দিকে একটু বেশিই মনোযোগ দেবে। সেটা বড় অস্বস্তিকর।

সংক্ষেপে এই হলাম আমি। আমার সেল্ফ পোর্ট্রেটটা অনেকটা এরকম—খুব সুন্দরী নয়, অহংকারী, আর্ট-কালচারের জন্য কেরিয়ার করা ছেড়েছে, আসলে ভীষণ বোকা, আর চোখের মধ্যে ডাকিনীর দৃষ্টি আছে।

আরও একটু 'আমি' আছে। যে 'আমি'-কে আমিও ভাল চিনি না আর তাকে নিয়েই আমার মুশকিল। আমার ভিতরে এই অচেনা আমি মাঝে মাঝে এমন সব জট পাকিয়ে তোলে যে, আমি সেই সব জট কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। যখন আমি খুব ছোট্টটি, মেয়েবোধও জন্মায়নি, সেই তখনকার কথা। কত বয়স হবে তখন, পাঁচ-ছয় বছর বড়জোর! বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছি, একটু একটু ছাঁট আসছে ভিতরে। আর বাইরেটা অপরূপ আবছায়া। ওই আবছায়ার ভিতরে যেন লুকিয়ে রয়েছে রূপকথার সেই অবাক জগৎ। রাস্তায় লোকজন নেই, কাক কি কুকুর নেই, মানুষের শব্দ নেই, গাড়ি-ঘোড়া নেই, তুমুল বৃষ্টির ঘেরাটোপে সব মুছে গেছে আর ওই রুপোলি বৃষ্টির ক্ষুরধার অরণ্য থেকে যেন এক পথভ্রষ্ট রাজপুত্তুর বেরিয়ে এসে অবাক আর একটু বিরক্তিভরা

চোখে চারপাশে চেয়ে দেখল। ঠিক সেই সময়ে আকাশ ভেঙে ভীষণ গর্জে উঠে নেমে এল রাগী বজ্র। আমি দু'হাতে কান চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। রাজপুত্তুর একটুও ভয় পায়নি, কিন্তু ধীর পায়ে আমাদের খোলা বারান্দায় উঠে এসেছিল সে। আমার নতুন শিশুচোখে তাকে ঠিক রাজপুত্তুরের মতোই লেগেছিল সেই দিন। ফরসা রং, কী সুন্দর মুখ-চোখ, কী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি তার শরীরে! চারদিকের এত সামান্যতায় তাকে যেন মানাচ্ছিল না। তলোয়ার ছিল না, ঘোড়াও নয়। কিন্তু তাতে কী! তবু রাজপুত্তুর বলে ঠিক চেনা গিয়েছিল। ওই কয়েক লহমা মাত্র। তারপর সে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল।

চলে গেল কথাটা বললাম বটে। সে কিন্তু একটুও গেল না। রয়ে গেল, আমাদের খোলা বারান্দায় কয়েক মুহূর্তের অবস্থান থেকে সে চিরকালের মতোই বুঝি ডেরা বেঁধে ফেলল আমার মাথায়। আমার মনে।

পুতুল খেলতে বসি, মিছিমিছি রাঁধি-বাড়ি আর মনে মনে যেন রাজপুত্তুরের জন্য বসে থাকি। জন্মদিনে সাজানো হচ্ছে আমাকে, কপালে-গালে চন্দনের ফোঁটা, ঠোঁটে রং, গায়ে চুমকি বসানো পোশাক। আর আমার মন খারাপ লাগছে, এ সাজে রাজপুত্তুর কি দেখতে পাবে আমাকে?

বড় হচ্ছি, দেহবোধ আসছে, পৃথিবী পালটে যাচ্ছে, কিন্তু সেই কিশোরকে কিছুতেই ছাড়ানো গেল না, তাড়ানো গেল না। বৃষ্টির মধ্যে আর সেরকম দেখা হয়নি বটে। সে কি আর দু'বার হয়? কিন্তু এই ধুলোটে শহরে তাকে আরও কয়েকবার

চোখে পড়েছে। যতবার চোখে পড়েছে ততবার বুকের ভিতর একটা হায়-হায় হত। ছবি আঁকি, প্রাইজ পাই, আর ঠিক তখনই বায়ুগ্রস্তের মতো ঠিক মনে পড়ে তার কথা। সে কি জানে যে, আমি ছবি আঁকতে পারি? সে কি আমার কবিতা কখনও পড়ে? সে কি কখনও একটু দেখেছে আমাকে? এই যে আমি একজন হাপিত্যেশ মেয়ে এক কোণে আপনমনে বড় হয়ে যাচ্ছি, সে কি তার খবর রাখে!

অথচ সে চেনা বাড়ির ছেলে। আমাদের বাড়ি থেকে তার বাড়ি অনেক দূরেও নয়। তাকে দেখার জন্য যে উতলা হয়ে পড়ি তাও নয়। হয়তো এ কোনও প্রেমও নয়। কেবল বায়ুগ্রস্ততা। তবু আমার ভিতরে মৃদু পিপাসার মতো, হাহাকারের মতো কিছু একটা হয়ে যায়। আমার ভিতরটা যেন উৎকর্ণ থাকে তার জন্য। যখন নাইনে পড়ি তখন তাকে আমি একটা চিঠি দিই। আশ্চর্য চিঠি। এক্সারসাইজ বুকের একটা শূন্য পাতা—তাতে লেখা নেই, রেখা নেই, একটা আঁচড়ও নেই। নাম বা ঠিকানাও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল ওই শূন্য পাতায় আমার অনেক কথা আছে, ঠিক পড়ে নেবে সে।

এই ছোট্ট গল্পটা অবশ্য চিরকাল অসমাপ্ত থেকে যাবে। কোনও পরিণতি নেই এর। হয়তো দরকারও নেই। গল্পটা এরকমই থাক। সব গল্প কি শেষ হয়?

চিত্রলেখা

আমাদের জানালার পাশেই কদমগাছ। এই বর্ষায় ঝেঁপে ফুল এল, আর বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে কনের মতো গয়নায় গয়নায় সেজে উঠল গাছ। জানালার পাশে যখনই দাঁড়াই দেমাকে মক মক করে গাছটা রোজ বলে, আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে না? দেখো তো ভাল করে! আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে গাছপালা বড় একটা দেখা যেত না। ওই একটু-আধটু। ও বাড়িতে এখন কারা থাকে কে জানে! কোন এক পালবাবু বাড়িটা কিনে নিলেন। শুধু লেনদেনের সম্পর্ক হল, তাদের সঙ্গে আমাদের চেনা পরিচয় হল না।

এ জায়গাটা সেরকম নয়। এখানে বেশ গাছপালা আছে, একটু-আধটু ফাঁকা জায়গাও আছে, পশ্চিমধারে একটা মাঠে জল-কাদায় ফুটবল খেলে ছেলেরা। তাদের প্রাণবন্ত চেঁচামেচি আর শ্বাসের শব্দও শুনতে পাই। কলকাতা থেকে, চেনা পরিচয় থেকে আমাদের সরে আসতে হল। আমার স্বামী সুস্নাত রায় চেয়েছিলেন, অজ্ঞাতবাসে যাবেন। কিন্তু এ যুগে এত আইডেন্টিটির প্রশ্ন ওঠে যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস তো সম্ভব নয়। এখানে আমাদের একটা বাড়ি কিনতে হল, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হল, পেনশন পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে হল, ইনকাম ট্যাক্সের উকিল ঠিক করতে হল। তবু একরকম আত্মগোপনও করা গেল এইভাবে। আসল কথা আমরা পালালুম। আমাদের পুরনো মোবাইলের সিম কার্ড পালটে ফেলা হল। আমরা দু'জনেই বড্ড ভিতু মানুষ।

আমাদের মতো ভিতু মানুষ আমরাই কখনও দেখিনি।

আমাদের এই একটা বিষয়ে খুব মিল। তবে মিলের চেয়ে অমিল অনেক বেশি। সুস্নাত আর আমার বয়স সমান সমান। আমরা পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি। একসঙ্গে পড়তাম। তারপর যা হয় আর কী! সুস্নাতর অনার্স ছিল দর্শনে, আমার ইংরেজিতে।

এই যে সমান সমান বয়সে বিয়ে, তাতে প্রথম প্রথম তেমন বেসামাল লাগত না। দু'টি যুবক-যুবতী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বলে কথা, তাকে কি এড়ানো যায়! আমি পরিষ্কার টের পেতাম সুস্নাতর তুলনায় আমি একটু তাড়াতাড়ি বুড়ো হচ্ছি। এটা কমপ্লেক্সও হতে পারে। তবে তাই যদি হয় তা হলে সেটাও একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সুস্নাত বেশ সুপুরুষ। বরাবর একটু দাড়ি আর গোঁফ রাখত। ছিপছিপে, ফরসা, বেশ কাটা কাটা মুখচোখ। কিন্তু কোনও আলগা স্মার্টনেস নেই ওর। ভুলোমনের ভাবজগতের মানুষ। চোখ সবসময়ে দূরের কোনও কিছুর দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু বর্ণচোরা আম। ওর বয়স বোঝা যেত না। এখনও যায় না।

সুস্নাত খুব ভাল রেজাল্ট করে অবশেষে কলেজে চাকরি পেল। আমিও পেলাম, স্কুলে। আমাদের একটাই ছেলে। সারস্বত আমাদের ছেলে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি আমাদের ছেলেই বা বলি কী করে! আমাদের দু'জনেরই চাকরি। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, আমাদের পাশের বাড়িটাই সুস্নাতর দিদির। দিদি সুস্নাতর চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় এবং নিঃসন্তান। কাজেই পিসি পিপাসার্ত বুকে সারস্বত বা বিল্টুকে এমনভাবে টেনে নিল যে, আমাদের আর তাকে নিয়ে চিন্তা রইল না। বলতে কী

বিল্টু পিসির কাছেই মানুষ। সুস্নাতর বাবা-মা ছিল না। সুতরাং পৈতৃক বাড়িটা একদম ফাঁকা। দিদি ছাড়া সুস্নাতর কোনও ভাইবোনও নেই। সেদিক দিয়ে আমি হয়তো ভাগ্যবতী। অন্তত প্রথম প্রথম তো তাই মনে হয়েছিল। এখন কিন্তু আমার কিছু কিছু পুরনো ধারণা পালটাতে হচ্ছে। যা প্রথমে হঠাৎ খুব ভাল মনে হয় তাই কালক্রমে ভীষণ অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে।

এই নতুন জায়গায় এসে আমার একটুও ভাল লাগছিল না। অজ্ঞাতবাস করবে বলে সুস্নাত এমন একটা শহর খুঁজে বের করেছে যেখানে আমাদের কেউ চেনাজানা নেই, কোনও আত্মীয়-স্বজনও নয়। আর এই পাড়াটা শহরতলি বলে বেশ একটু ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। আমাদের পিছনেই একটা পোড়ো জমিতে জঙ্গল হয়ে আছে, পুবদিকে পাশের প্লটটাতে একটা বাড়ি কয়েক ফুট দেওয়াল গাঁথার পর এমনিই পড়ে আছে কতদিন কে জানে। ইটগুলোয় শ্যাওলা ধরেছে। সন্ধের পরই পাড়াটা ভীষণ নির্জন হয়ে যায়। সুস্নাতর সময় কাটে বই নিয়ে। বরাবর বই পড়া ওর নেশা। আমার আবার তত পড়া-বাই নেই।

মাস দুই আগে বিকেলের দিকে একতলার সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছি একদিন। সামনের রাস্তা দিয়ে কিছু লোক-চলাচল দেখছি। হঠাৎ একটা ছেলে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মাসিমা, একটু বরফ দেবেন? আমাদের একটা ছেলের খুব চোট হয়েছে।

ও মা, সে কী! দাঁড়াও দাঁড়াও, দিচ্ছি।

একটা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে খানিকটা বরফের টুকরো এনে

দিলাম। সে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে দৌড়ে চলে গেল। ছেলেটার বয়স তেরো-চোদ্দো হবে বোধহয়। বেশ দিঘল চেহারা, মুখখানা ভারী মিষ্টি। দেখলেই মায়া হয়। এই বয়সে ছেলেরা এরকমই তো থাকে। বড় হয়ে কেন যে এত পালটে যায়! আমার বিল্টু যেমন। এই বয়সে বিল্টু একটু অন্যরকম ছিল হয়তো। সমস্যাটা হয়েছিল, বিল্টু পিসির কাছে মানুষ, পিসির অতি আদরে লালিত-পালিত, মায়ের সঙ্গে তাই তার সেই সম্পর্কটাই গড়ে উঠল না। হিসেবের গোলমালটা আমিই করেছিলাম যে! স্কুল করে সন্ধের পর ফিরে বাচ্চার ঝামেলা পোহাতে হত না বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে রাতে পিসি ছেড়ে দিত বিল্টুকে। আমাদের কাছে এসে রাতে শুত। তখনই যা মায়ে-পোয়ে একটু কথা হত। তখন আমার বয়স কম বলেই বোধহয় আগ্রাসী মাতৃত্বের অধিকার তেমন মাথাচাড়া দেয়নি। ভাবতাম, জন্ম দিয়েছি, ছেলে তো আমারই। আর ওইখানেই ভুলটা হয়েছিল।

দু'-চার দিন পর সেই ছেলেটা আবার এল একদিন, মাসিমা, একটু জল খাওয়াবেন?

ও মা! খাওয়াব না কেন? এসো, ভিতরে এসো।

খুব তেষ্টা পেয়েছিল বোধহয়, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গ্লাসের সবটুকু জল শেষ করে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি বললাম, কোন বাড়ির ছেলে তুমি?

এ রাস্তা দিয়ে গেলে পশ্চিমে যে-মোড়টা পড়বে তার তিনটে বাড়ির পর। হলুদ দোতলা।

তোমার নাম কী বাবা?

পিকু বললে সবাই চেনে। আচ্ছা, মেসোমশাই কি প্রোফেসর?

ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। তুমি কী করে জানলে?

ওঁকে দেখলেই মনে হয় প্রোফেসর। আমরা বন্ধুরা তাই বলাবলি করছিলাম।

হেসে বললাম, আর আমাকে দেখে কী মনে হয় পিকু?

আপনাকে দেখে? না, কিছু মনে হয় না তো!

বলতে পারলে মিষ্টি খাওয়াব।

আচ্ছা, ভেবে বলব।

এইভাবে পিকুর সঙ্গে ভাব হল। সে তেমন কিছু ভাব নয়। রোজ পশ্চিমের মাঠে ফুটবল খেলতে আসে। যাতায়াতের সময় চোখে চোখ পড়লে হাত তুলে বলে, হাই মাসিমা।

আমিও বলি, হাই পিকু।

ব্যস এইটুকুই। তবু এইটুকুও অনেকখানি। ছেলেটাকে দেখলেই আমার ভারী ভাল লাগে।

তবে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের আরও একটু ভাব হল। পিকু একদিন এসে গ্রিলের ওধার থেকেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশাই কি ফিলজফির প্রোফেসর ছিলেন?

আমি বললাম, বাইরে কেন পিকু? ভিতরে এসে বোসো আমার কাছে।

না। আমার সারা গায়ে কাদা। জামাপ্যান্ট সব ভেজা।

তা হলে একদিন পরিষ্কার হয়ে এসো, গল্প করব। হ্যাঁ, তোমার মেসোমশাই ফিলজফির প্রোফেসর ছিলেন। কে বলেছে তোমাকে?

দিদি বলেছে, মেসোমশাই নাকি টাউন লাইব্রেরিতে গিয়ে ফিলজফির বইয়ের খোঁজ করছিলেন।

তোমার দিদি আছে বুঝি? কত বড়?

অনেক বড়। দিদি বাংলা অনার্স পড়ে।

বাহ্, তা হলে তো বেশ বড়।

দিদি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি পড়ার চান্স পেয়েছিল। ইচ্ছে করেই যায়নি।

ভারী অবাক হয়ে বললাম, সে কী! জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক করে কেউ বাংলা অনার্স পড়ে নাকি?

সবাই তাই বলে। দিদিটা একটু পাগলি আছে। তবে দারুণ ছবি আঁকে আর কবিতা লেখে আর গানও গায়।

ভীষণ ইন্টারেস্টিং মেয়ে তো!

একদিন দিদির আঁকা ছবি আপনাকে দেখাব।

শুধু ছবি কেন, তোমার দিদিকেই তো আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। সে কি বললে আসবে আমাদের বাড়িতে?

কে জানে! মুডের ব্যাপার।

খুব মুডি বুঝি?

ভীষণ। দিদিকে দিয়ে জোর করে কিছু করানো যায় না।

দু'দিন পর একদিন পিকু এসে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ বের করে আমাকে দেখাল। ভাঁজ খুলে আমি অবাক হয়ে দেখলাম একটা মুখের পেনসিল স্কেচ। মুখটা পিকুর এবং আঁকাটা নিখুঁত। কয়েকটা হেলাফেলার আঁচড়ে যে এত সুন্দর হুবহু মুখের প্রতিচ্ছবি আঁকা যায় এটা আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না।

আমি বললাম, তোমার দিদিকে বোলো, সে ইচ্ছে করলে খুব বড় আর্টিস্ট হতে পারবে।

পিকু ঠোঁট উলটে বলল, ওসব বলে কোনও লাভ নেই। দিদি পাত্তাই দেয় না। বলে, আমার যতক্ষণ ভাল লাগবে, যতদিন ভাল লাগবে ইচ্ছেমতো আঁকব। ইচ্ছে না হলে আঁকব না।

বুঝতে পারছি, তোমার দিদি সত্যিই মুডি। দাঁড়াও, একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করতে বিনা নিমন্ত্রণেই তোমাদের বাড়ি যাব। আমার মনে আছে, পশ্চিমের মোড় পেরিয়ে দুটো বাড়ি পর হলুদ দোতলা। ডান দিকে না বাঁ দিকে তা অবশ্য জানি না।

ডান দিকে। আপনি যেদিন যাবেন বলবেন, আমি এসে নিয়ে যাব।

আমাকে যেতে হল না। এক রোববার মেয়েটিই এল, সন্ধের পর। এল একাই। ডোরবেল বাজতেই গিয়ে দরজা খুলে দেখি বারান্দার গ্রিলের গেটের বাইরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটু লাজুক হাসি। আমি প্রশ্ন করার আগেই ভারী মিষ্টি গলায় বলল, আমি পিকুর দিদি। আমার নাম মধুপর্ণা।

ও মা! এসো এসো, তোমাকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিল আমার।

ভিতরে এসে যখন বাইরের ঘরের একটা চেয়ারে বসল তখন ওকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেছি। প্রথাগত সুন্দরী নয়। কিন্তু যাকে বলে স্ট্রাইকিং, ঠিক তাই। খুব ফরসা নয়, তবে মুখচোখের উজ্জ্বলতা যেন রঙের খামতি পূরণ করতে দিয়েছে। একটু ভাল করে তাকিয়ে থাকার পর বুঝলাম, এ ভীষণ ব্যক্তিত্বওয়ালা মেয়ে। এই মেয়ে সহজে বশ মানার পাত্রী নয়।

নিজস্বতা আছে। সারাটা জীবন তো আমি টিনএজার মেয়েদের সঙ্গেই কাটালাম। অভিজ্ঞতা বড় কম হয়নি। আমি যত জনকে দেখেছি কারও সঙ্গেই যেন একে মেলানো যায় না।

পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি মাস্টারি করেছি বটে, কিন্তু ছাত্রীদের চেয়ে গুণে এগিয়ে আছি বলে ভাবতে পারিনি কখনও। কারণ দেখেছি, আমি কমপিউটার বোঝার আগেই তারা কমপিউটার রপ্ত করে বসে আছে। এমন অনেক তথ্য আমার জানা নেই কিন্তু আমার ছাত্রীদের অনেকে জানে। ক্লাসিক্যাল বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক, রক বা পপ, ইংরেজির অনেক আধুনিক এক্সপ্রেশন, দুরূহ নাচের টেকনিক্যাল দিক বা রাজনীতি কিংবা ভূগোল। এই যে মোবাইল ফোনের সব ফাংশন আমি এখনও জানি না, কিন্তু ছাত্রীদের কাছে জলভাত। অনেক সময় ছাত্রীদের কাছেই আমাকে কিছু কিছু শিখতে হত। এই মেয়েটিকে দেখেও আমার মনে হল, এর সঙ্গে সাবধানে কথা কইতে হবে। আমি প্রশংসা দিয়েই শুরু করলাম, এত ভাল ছবি আঁকো তুমি! আমি ভাবছিলাম, এখানে তো আমার সময় কাটতে চায় না, তোমার কাছে একটু ছবি আঁকা শিখে নিই।

মেয়েটা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, যাঃ, কী যে বলেন! আমি তো এমনি শখ করে আঁকি।

আর কী করো তুমি? শুনেছি কবিতা লেখো!

একটু আধটু। আর্টিস্ট বা কবি হওয়ার জন্য নয়। ভাল লাগে, তাই।

আরও শুনেছি তুমি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক করেও ডাক্তারি পড়তে যাওনি।

আমার ইচ্ছে হয়নি।

বেশ করেছ। যা ভাল লাগে না তা পড়তে যাবে কেন? এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ভাল না লাগলেও পড়ে। তোমাকে এর জন্য বোধহয় বাড়িতে বকুনি খেতে হয়েছে।

মিটিমিটি হাসছিল। বলল, শুধু মা। বাবা আমার দলে।

আমি হাসলাম, সব বাবাই একরকম। আমার বাবাও সব সময়েই আমার দলে থাকতেন।

সুস্নাতর হাঁটার নেশা। একবার কোন একটা বিপজ্জনক পথ বেয়ে কেদার-বদ্রী পর্যন্ত ঘুরে এসেছিল। এখনও সারাদিন হাঁটে। ওর মত হল না হাঁটলে ওর চিন্তার কলটা চালু হয় না। হাঁটতে হাঁটতে ও ভাবে। আর ভাবতে ভাবতে হাঁটে। ভাবনা এবং হাঁটা এ দুটোই ওর প্যাশন। এখানে আসার পর থেকে বাধামুক্ত পথঘাট পেয়ে ওর হাঁটার রোখ বেড়ে গেছে। এত হাঁটে বলেই শরীরে একটুও মেদ নেই। আর তাই এখনও ওকে একটু ছোকরা গোছের লাগে। আর সেইটেই আমার পক্ষে ভীষণ লজ্জার। একে তো আমি ওর সমান বয়সি, তার ওপর আমার শরীরে বয়সোচিত মেদ জমেছে, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশ বেশি, সামান্য সুগারও আছে। এখন সুস্নাতর পাশে আমাকে একেবারেই মানায় না। তার ওপর আবার আমি মোটেই সুন্দরী নই। সত্যি বলতে কী আজকাল লোকের সামনে সুস্নাতর সঙ্গে একসঙ্গে বেরোতে আমার ভারী লজ্জা করে।

আমি আর মধুপর্ণা কথা বলতে বলতেই সুস্নাত তার লম্বা হাঁটা সাঙ্গ করে ফিরে এল। আমি সুস্নাতকে বললাম, এসো আলাপ করিয়ে দিই।

মধুপর্ণা বলল, আমি ওঁকে চিনি।

ও মা, কী করে চেনো?

সেদিন টাউন লাইব্রেরিতে আমিই যেচে আলাপ করেছিলাম।

সুস্নাত প্রচণ্ড ভুলো মনের মানুষ। কথাটা শুনে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে আমার বেশ চেনা চেনা লাগছে। কী নাম যেন তোমার?

মধুপর্ণা।

আমি হেসে বললাম, যতবার বলবে ততবারই সুস্নাত ভুলে যাবে। আমার নামও বোধহয় মনে রাখতে পারে না।

সুস্নাত খুব অপ্রতিভ আর অসহায় হাসি হেসে বলল, ঠিক তা নয়। আসলে আমার মেমরি রিকল-এ একটু দেরি হয়। ব্যাপারটা কীরকম জানো? ধরো ওই যে অ্যাশট্রেটা, ওটাকে দেখে তুমি অ্যাশট্রে বলে বুঝতে পারছ কী করে? আমরা জানি যে বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ থাকাটা জরুরি। আইনস্টাইন বলতেন, না, আরও একটা ডাইমেনশন হল টাইম। কিন্তু তা ছাড়াও বস্তুর কি বহু ডাইমেনশন নেই? যেমন ধরো, মেমরি। ওই অ্যাশট্রেটাকে অ্যাশট্রে বলে তুমি তখনই চিনতে পারবে যখন ওই বিশেষ মেমরিটা ফ্ল্যাশ করবে। নইলে নয়। বস্তুর আরও একটা ডাইমেনশন হল তার ফাংশনালিটি। জিনিসটার উপযোগিতা যদি না জানো তা হলে বস্তুটাকে চেনা বা বোঝা কঠিন হবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আচ্ছা আচ্ছা, এখন ওসব কথা থাক।

মধুপর্ণা কিন্তু খুব মন দিয়ে সুস্নাতর কথা শুনছিল। এবার

বলল, আমার ফিলজফি কম্বিনেশন আছে। মাঝে মাঝে বুঝতে একটু প্রবলেম হয়। কখনও কি আপনার কাছে আসতে পারি?

সুস্নাত উদার গলায় বলে, আরে নিশ্চয়ই! প্রবলেম হলেই চলে এসো।

মধুপর্ণা বেশিক্ষণ বসল না। কিছু খেল না। বেশি কথাও বলল না।

সুস্নাতকে বললাম, মেয়েটার বোধহয় এ বাড়িতে এসে খুব একটা ভাল লাগল না।

সুস্নাত অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি! কেন বলো তো? আমার কোনও কথা কি বেফাঁস হয়ে গেল?

না, তা নয়। হয়তো আমাদের পছন্দ হল না ওর।

সুস্নাত খুব চিন্তিত হয়ে বলল, তাই তো! কী করা উচিত ছিল বলো তো?

আমি জানি ব্যাপারটা দু'মিনিটের মধ্যেই সুস্নাত ভুলে যাবে। ওর মাথায় যে মেমরির খোপটা আছে তাতে এইসব ঘটনাবলি ঢুকতেই পারে না। কিন্তু মুশকিল হয় আমার। আমিও যদি ওর মতো লাগামছাড়া দার্শনিক চিন্তায় ভেসে যেতে পারতাম তা হলেই বোধহয় ভাল হত। অবশ্য তাতে সংসার ডুবে যেত।

সংসার অবশ্য বার কয়েক ডুবতেই বসেছিল। আনমনা, ভুলোমন, দর্শনের এই আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ অধ্যাপকটি আমার হাড়মাস কম জ্বালায়নি। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ের সঙ্গে গুরুতর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। তার নাম কমলিকা। দেখতে দারুণ, ভীষণ স্মার্ট

আর ডানপিটে। সেই মেয়ে এই অ্যাডোনিসের মতো সুপুরুষ অধ্যাপকটির প্রেমে পড়ে এমন পাগল হয়েছিল যে, আমাকে ফোন করে বলেছিল, প্লিজ দিদি, আপনি ওকে ছেড়ে দিন। আমি ওকে ছাড়া বাঁচবই না।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত। বুদ্ধি করে আবার দিদি ডাকছে। তার মানে জল গড়িয়েছে অনেক দূর। আমি এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, ফোনে আমি কিছুই প্রায় বলতে পারলাম না। বাক্যহারা যাকে বলে। মেয়েটাই ইংরেজি আর বাংলায় একগাদা আবেগের কথা বলে গেল। বোঝা গেল ওরা দু'জনেই দু'জনের গভীর প্রেমে পড়েছে, যে-কোনও মূল্যে ওরা পরস্পরকে চায়। কোনও বাধাই মানবে না। দরকার হলে ধর্মান্তরিত হবে ভয় দেখিয়ে রাখল।

রাত্রিবেলা যখন সুস্নাতর ওপর রাগে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তখন সুস্নাতর কোনও বিকারই দেখা গেল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, হ্যাঁ, এরকমই ঘটেছে। আর এরকম তো ঘটতেই পারে। আমি আর কমলিকা শিগগিরই বিয়ে করব।

আর আমি?

তুমি! তুমিও আর একটা বিয়ে করতে পারো, কোনও অসুবিধে নেই। একটা সম্পর্ক চিরকাল টেনে যাওয়াটার কোনও মানেই হয় না।

পাপবোধ, ধর্মভয়, সামাজিকতা বা দায়বদ্ধতা কিছুই যে সুস্নাতর মধ্যে কাজ করে না সেটা বুঝতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। মানুষটার ভিতরে কোনও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি, দেশ-কাল-দেশাচার-সংস্কার কিছুই ওকে স্পর্শ করে

না। আমি প্রচণ্ড চেঁচামেচি করলাম, রাগ করে খিমচে আঁচড়ে চুল টেনে পর্যুদস্ত করে দিলাম, কিন্তু সুস্নাত মোটেই উলটে রাগ দেখাল না। শুধু খুব যেন অবাক হয়েছে এমনভাবে বলতে লাগল, তুমি এরকম করছ কেন? এরকম তো হতেই পারে। আর এরকম সহজেই সব কিছু হওয়া উচিত। মানুষ কোনও বন্ধনেই আর একটা মানুষের কাছে আবদ্ধ থাকতে পারে না চিরকাল। সেরকম হওয়া উচিত নয়।

আমরা প্রস্তরযুগে নেই সুস্নাত, আমরা সামাজিক জীব।

কে বলল প্রস্তরযুগে নেই? প্রস্তরযুগে যে-প্যাশন ছিল এখনও ঠিক সেই প্যাশনই আমাদের মধ্যে রয়েছে। তাকে আটকানোর বৃথা চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।

সুস্নাতর দিদি অলকানন্দা সময়মতো আসরে না নামলে কী হত বলা মুশকিল। অলকানন্দাও যে সহজে পেরেছিল তা নয়। সে আর তার বর মিলে ধরে-বেঁধে সুস্নাতকে অনেক বুঝিয়েও যখন লাভ হয়নি তখন কঠোরতর পন্থা নিতে হয়।

এই ঘটনার সময় আমার ছেলের বয়স বোধহয় বছরখানেক। শখ করে ছেলে কোলে স্বামী-স্ত্রী আমরা অনেক ছবি তুলেছিলাম। অলকানন্দাদির বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী বর রজত গাঙ্গুলি সেই ছবি নিয়ে সোজা গিয়ে কমলিকার বাবা বাণীব্রত সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করলেন। বাণীব্রত কর্পোরেট দুনিয়ার সফল মানুষ। প্রচুর টাকা এবং ক্ষমতা। তিনি নাকি ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন, যা হোক, তবু কমলিকা এতদিনে একজন ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে দেখছি। এতদিন তো কতগুলো লাফাঙ্গা, বদমাশ, ভ্যাগাবন্ড জুটিয়ে আসছিল। আপনি ভাববেন

না, মেয়েকে আমি চিনি। শি উইল কাম ওভার ইট।

যতদূর জানি, তিনি কমলিকাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য ব্যাঙ্কক চলে গিয়েছিলেন। আর আমার পদাতিক স্বামী সুস্নাতকে কয়েকটা অচেনা ছেলে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা গলির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে রাত্রিবেলা খুব পেটায়। সুস্নাত ভীষণ ভিতু। মারধর, গুন্ডামি. জঙ্গিপনাকে খুব ভয় পায়। সেই মার খেয়ে সুস্নাত বেদম কুঁকড়ে গেল। ছেলেগুলো অবশ্য খুব হিসেব করেই মেরেছিল, যাতে হাত-পা না ভাঙে বা রক্তারক্তি না হয়। সেসব হয়ওনি। তবে সুস্নাত এমন ভয় পেয়েছিল যে, কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি এবং আমাকেও বেরোতে দেয়নি। এইভাবে ফেরত হল সুস্নাত।

এর পরের ঘটনা এত সহজে মেটেনি। হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে আর বাড়িতে ফিরল না সুস্নাত। অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করে অবশেষে পুলিশে খবর দেওয়া হল। সারা রাত কলকাতার সমস্ত হাসপাতাল আর নার্সিং হোমে, এমনকী মর্গে অবধি খোঁজ করা হয়েছিল। অলকাদি আর আমি হাপুস কেঁদে ভাসিয়েছিলাম। অগতির গতি রজত গাঙ্গুলি নাওয়া-খাওয়া ভুলে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছিলেন। দু'দিন সম্পূর্ণ বেপাত্তা থাকার পর আমার বাবার এক বন্ধু শম্ভুকাকা পুরী থেকে ট্রাঙ্ক কল করে বাবাকে জানালেন, সুস্নাতকে একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে পুরীর এক হোটেলে অবস্থান করতে দেখা গেছে। ভদ্রমহিলা রোগা, দাঁত উঁচু এবং শ্যামলা রং। দিন সাতেকের মাথায় সুস্নাত বেশ ভালমানুষের মতো নির্বিকার মুখে ফিরে এল। মুখে কোনও অপরাধবোধ নেই।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সুস্নাতর মতো এমন প্রতিক্রিয়াহীন মানুষ আমি কখনও দেখিনি।

আমি ঠান্ডা গলায় শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহিলাটি কে?

সুস্নাত দিব্যি একটু লাজুক হেসে বলল, ওই একজন। একটা কলেজে পড়ায়। সেমিনারে আলাপ।

বাহ্, চমৎকার!

আবার প্রচণ্ড ঝগড়া করলাম আমি। তবে একতরফা। সুস্নাত শুধু বারবার বলার চেষ্টা করে গেল, এতে কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। এ হল বহতা নদীতে স্নান করার মতো। পৃথিবীর ইতিহাসে নরনারীর সম্পর্ক বারবার বিচিত্র পথেই ভ্রমণ করেছে ইত্যাদি, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। আমার ছেলের তখন ছয় বছর বয়স। এসব তো তার কানেও যাচ্ছে এবং কিছু না কিছু তো সেও বুঝতে পারছে। রজত গাঙ্গুলিই খবর আনলেন, ভদ্রমহিলা বিবাহিতা, তবে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নাম শ্যামলী।

আমার নন্দাই রজত গাঙ্গুলির ওপর আমার আস্থা প্রবল। উনি খুব ডাকাবুকো মানুষ। বাস্তববুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। একদিন আমাকে এসে বললেন, শোনো চিত্রা, তোমাকে শ্যামলী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শুনেই ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আসলে আমি কারও সঙ্গেই সম্মুখ সমরে পেরে উঠি না। আর এসব অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমি দুর্বল ও অসহায়তায় এমন কাবু হয়ে পড়ি যে, মনের জোর বলতে কিচ্ছু থাকে না। আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, দেখা করে কী করব?

কী করবে মানে! তোমার লেজিটিমেট স্বামীকে নিয়ে একজন হবনব করছে তুমি কি তাকে ছেড়ে দেবে? অন্য বউ হলে সে তো শ্যামলীর মুখ ভেঙে দিয়ে আসত।

আমি যে ঝগড়া করতে একদম পারি না দাদা!

তা বললে হবে কেন! তুমি নরম সরম ভিতু মেয়ে আমি জানি, কিন্তু এটা তো তোমার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। ইয়ারকি তো নয়। শ্যামলীকে আমি ফোন করেছিলাম। অনেক কথা হল। খুব চালাক-চতুর আর অ্যাগ্রেসিভ মেয়ে। কিন্তু ভয় পেয়ো না, তোমার পয়েন্ট অনেক স্ট্রং।

আমি পারব না দাদা। যখন আমি সুস্নাতকেই কন্ট্রোল করতে পারছি না, তখন শ্যামলীর সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ?

সুস্নাত তো পাগল। ওর কি মাথার ঠিক আছে! ও আর সব ব্যাপারে ভিতু, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ওকে ডিফাইন করা মুশকিল। কিন্তু শ্যামলীকে আমার লজিক্যাল বলেই মনে হল। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছে।

আমি নিভে গেলাম। কী বলব আমি মহিলাকে? আমি যে উত্তেজিত হলে বা ভয় পেলে কথা হারিয়ে ফেলি।

আর হলও ঠিক তাই। রজতদা এক বিকেলে তাঁর গাড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলেন। ময়দানের এক গাছতলায় মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। রজতদা দূরে গাড়িতে বসে রইলেন। আমি কাঁপা বুক আর কাঁপা পায়ে গিয়ে শ্যামলীর মুখোমুখি বসলাম।

যতটা কুচ্ছিত হবে বলে ভেবেছিলাম শ্যামলী ততটা তো নয়ই, বরং একটু উঁচু দাঁত, শ্যামলা রং আর রোগাটে

হওয়া সত্ত্বেও বেশ আকর্ষক চেহারা। আমার একটা মানসিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে। আমি সুন্দর নই বলেই কি সুস্নাত বারবার আকর্ষণীয় মেয়েদের দিকে ঢলে পড়ছে! সেক্ষেত্রে পরাভব মেনে না নিয়ে আমার উপায় কী? চেহারা তো বদলানো যাবে না। শ্যামলীর সামনে ভয় ছাড়াও এই হতাশাও আমাকে গিলে বসে রইল।

একটা ঘাসের ডাঁটি চিবোতে চিবোতে শ্যামলী বলল, আপনি খুব আপসেট মনে হচ্ছে! কিন্তু একটু ভেবে দেখুন এক্সট্রা-ম্যারিটাল রিলেশন তো নতুন কিছু নয়। এরকম ঘটেই যায়। এক্ষেত্রে আপনার যখন কিছুই করার নেই, তখন মেনে নিচ্ছেন না কেন?

মেনে নেব! কী করে মেনে নেব?

মেনে না নিলে সুস্নাতকে ডিভোর্স করতে হয়। পারবেন? যতদূর শুনেছি ইউ আর হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ উইথ সুস্নাত। দ্যাটস ফাইন। আগে তো পুরুষরা তিন-চারটে বিয়ে করত। করত না? বলুন!

তা বলে এ যুগে?

বহু বিবাহ আইন করে বন্ধ করা গেছে ভাবছেন? ভুল। ওই জিনিসই এখন একস্ট্রা-ম্যারিটাল রিলেশনস। আপনার ভাগ্য ভাল যে, তবু সতিন নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে না।

শেষ অবধি তর্কে গো-হারা হেরে ফিরে এলাম। অলকাদি রাগ করে বলল, চুলের মুঠি ধরে কয়েকটা চড় কষালে না কেন?

রজতদা বললেন, ওটা চিত্রার লাইন নয়, ওকে বকছ কেন? সবাই কি সব পারে?

সুতরাং শ্যামলীর সঙ্গে সুস্নাতর সম্পর্কটা রয়েই গেল। পরবর্তী চার বছর ধরে চলেছিল ব্যাপারটা। তবে আর উধাও হয়ে যেত না। সুস্নাত মাঝে মাঝে বেশি রাতে ফিরত বা উইকএন্ডে সেমিনার বা অন্য কোনও ছুতোয় দিল্লি বা মুম্বই যাওয়ার নাম করে কেটে পড়ত। মোটামুটি সবাই টের পেতাম, কিন্তু কিছু করার ছিল না।

কিন্তু এইসব ঘটনার সারাৎসার, ফিডব্যাক আমাদের অজান্তে আরও একটা গোপন খাতায় জমা হচ্ছিল। ছেলের বারো বছর বয়স হল। দিঘল সুন্দর চেহারা, অনেকটা ওর বাবার মতোই। বাড়িতে অশান্তি বলে ইদানীং তাকে আর এ বাড়িতে পাঠাত না অলকাদি। কিন্তু বিল্টুর তো কিছু অজানা ছিল না। চেঁচামেচি, ঝগড়া সেও শুনতে পেত। অলকাদি আর রজতদার কথাও নিশ্চয়ই কানে যেত। মাঝে মাঝে তাই বিল্টুর চোখে আমাদের প্রতি তীব্র বিরাগ দেখতে পেতাম। তখন অতটা বুঝতে পারিনি যে, একটা টাইমবোমা আমাদের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে।

বিল্টুর জন্মদিনে আমি স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে ওকে সঙ্গে করে একটু বেড়াতে যেতাম। ভাল রেস্তরাঁয় দুই পরিবার মিলে ডিনার হত। সাধ্যমতো দামি উপহার দেওয়া হত বিল্টুকে। কিন্তু সারা বছর নানা জিনিস কিনে দিত ওর পিসি। আমাদের উপহার খুব ক্যাজুয়ালি নিত বিল্টু। মোড়ক খুলে দেখার আগ্রহও প্রকাশ পেত না।

একবার ওর তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে কী একটা উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে খেতে এসেছিল বিল্টু। বেশ সাধাসাধি করে আনতে হয়েছিল। শেষ অবধি এসেছিল পিসির ধমক খেয়ে।

তিনজন বসে খাচ্ছি। কিন্তু বিল্টু একটাও কথা বলল না, ঘাড় গোঁজ করে খেয়ে গেল। আমার নানা প্রশ্নের উত্তরে শুধু হুঁ-হাঁ করে জবাব দিয়ে গেল মাত্র। ও চলে যাওয়ার পর সুস্নাতকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁগো, বিল্টুকে লক্ষ করলে? কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে দেখেছ?

সুস্নাত ভারী অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? কীরকম বলো তো?

ও আমাদের মনে মনে ঘেন্না করে, বুঝতে পারোনি?

সুস্নাত আরও অবাক, ঘেন্না করে! ঘেন্না করবে কেন?

তুমি ছেলেকে কতটা ভালবাসো?

সুস্নাত ঘাড় নাচিয়ে বলল, কতটা! তা কী করে মাপা যায়? নিশ্চয়ই ভালবাসি। আফটার অল আমার ছেলে তো!

সে তো ঠিক কথা। বায়োলজিক্যালি তো ও আমাদেরই ছেলে। কিন্তু ওকে কি ভাল করে লক্ষ করেছ তুমি?

অফকোর্স। কেন করব না? বেশ টল ফিগার, হ্যান্ডসাম চেহারা। লক্ষ করব না কেন?

করোনি, করলে বুঝতে পারতে, শুধু জন্ম দিলেই সব হয়ে যায় না। বাবা হতে হয়, মা হতে হয়। আমরা বোধহয় তা পেরে উঠিনি।

কথাটা কানেই তুলল না সুস্নাত। হাত নেড়ে বলল, দূর দূর, ও সব তোমার কল্পনা। বিল্টু ঠিকই আছে।

কিন্তু বিল্টু ঠিক ছিল না।

ঠিক ছিল না সুস্নাতও। চার বছরের প্রেমপর্ব শেষ হওয়ার পর শ্যামলী হঠাৎ একজন সিন্ধি ভদ্রলোককে বিয়ে করে

জার্মানি চলে যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু সেই আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই, সুস্নাত এবং আমারও যখন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স তখন ফের গুঞ্জন আর ফিসফাস উঠল। সুস্নাতর বন্ধু অমিতাভর ক্যানসার হওয়ায় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বেশ ছোটাছুটি করেছিল সুস্নাত। এমনকী চ্যারিটি শো করে টাকা তুলে দিয়েছিল। মুম্বই নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসা করাতে, অমিতাভ বাঁচেনি। আর কী ঘেন্নার কথা, সেই অমিতাভর মাত্র ষোলো বছর বয়সি মেয়ে বিদিশার সঙ্গে হেঁটমুন্ডু হয়ে ঝুলে পড়ল সুস্নাত। শেষ অবধি কিছুই গোপন থাকল না। অমিতাভর বউ থানা-পুলিশ অবধি করেছিল। কিন্তু শেষ অবধি কেলেঙ্কারির ভয়ে অভিযোগ তুলে নেয়। ঘটনাটা খুব বেশিদূর গড়ায়নি, এই যা।

বিল্টু ভাল রেজাল্ট করল। ডাক্তারি পড়ল এবং পাশও করে গেল খুব ভালভাবে। সন্তানের কৃতিত্বে আমাদের গৌরব হওয়ার কথা। সেটা হয়তো হলও, কিন্তু আমাদের একমাত্র সন্তান সেটা আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে এল না। বোধহয় পিসির তাড়নায় কাঠের পুতুলের মতো এসে প্রণাম করে গেল মাত্র। বিজয়ায় বা নববর্ষে ওরকমভাবেই শুকনো দায়সারা প্রণাম করেই চলে যেত 'কাজ আছে' বলে। ডাক্তারি পাশ করার দু'বছর বাদে সে ক্যানসার নিয়ে রিসার্চ করতে চলে গেল বিদেশে। প্রথমে ইংল্যান্ড, তারপর আমেরিকা। সে বিদেশে যাওয়ার মাস দুয়েক আগে অলকাদি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। বিল্টুর শোক দেখেছিলাম। কী কান্না। মুখাগ্নি থেকে শ্রাদ্ধ অবধি নিখুঁতভাবে করেছিল, যেমনটা

অলকাদির ছেলে থাকলে করত। এমনকী মুণ্ডন অবধি। ওর পিসেমশাই বলেছিল, তোর মা-বাবা যখন বেঁচে আছে তখন তোর ন্যাড়া হওয়ার দরকার নেই। বিল্টু শোনেনি। বলেছিল, আমার মা-ই তো চলে গেল।

আমেরিকা থেকে মাসে বা দু'মাসে এক-আধবার ফোন করত বিল্টু।

হ্যালো মা, ভাল আছ সবাই?

আমি উথাল-পাথাল হয়ে বলে উঠতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই কেমন আছিস বাবা?

আমি ঠিক আছি। বলেই ফোন কেটে দিত। অথচ মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম, পাশের বাড়িতে বেশি রাতে রজত গাঙ্গুলির সঙ্গে বিল্টুর বেশ অনেকক্ষণ কথা হচ্ছে। বড্ড জ্বলুনি হত বুকে। সেই জ্বলুনিতে ইন্ধন দিতে একদিন বিল্টু ফোন করে বলল, শোনো মা, আমি একটি আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছি। আমার কলিগ। একসঙ্গে রিসার্চ করি। অ্যান্ড আই অ্যাম হ্যাপি।

ফের মাথায় বজ্রাঘাত। ও ফোন কেটে দিয়েছিল। আমিই আবার ফোন করে বললাম, ওরে কী বললি তুই? কী বললি?

চেঁচিয়ো না মা। বিয়ে করেছি, অ্যান্ড শি ইজ এ গুড গার্ল।

আমি পাগলের মতো ফোনে কী যে সব বলে গেলাম। ও পাত্তা দিল না। ফোন রেখে দিল।

সুস্নাত অবশ্য বিয়ের খবর পেয়ে একটুও উত্তেজিত হল না। বরং বলল, আরে বিয়েই তো করেছে। আর আমেরিকান তো কী। সেও তো একটা মেয়েই। সুস্নাত বিল্টুকে ফোন করে

অভিনন্দনও জানাল, এমনকী ওর বউ লিলিয়ানের সঙ্গেও কথাটথা কইল। আমি হাপুস নয়নে শুধু কেঁদে গেলাম। ছেলেটা এতদিনে সত্যিই পর হয়ে গেল বোধহয়।

কতটা পর তা বুঝতে একটু বাকি ছিল আমার। কয়েক বছর আগেকার কথা। একদিন রজত গাঙ্গুলি এসে বললেন, বিল্টু তোমাদের জন্য আমেরিকা যাওয়ার টিকিট পাঠাচ্ছে। আমাকেও বলেছিল। কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে, অত দূরে যেতে সাহস হয় না। তোমরাই যাও ঘুরে এসো। শুনে ভীষণ ভাল লাগল। এতদিনে বোধহয় মা-বাবার ওপর একটু টান হয়েছে ছেলের। বিদেশে পড়ে আছে, হতেই পারে।

বিল্টুও ফোন করে বলল, তোমাদের টিকিট আমার ট্র্যাভেল এজেন্ট পৌঁছে দেবে। চলে এসো দু'জনে।

বেশ ভালভাবেই বলেছিল।

যথা সময়ে আমরা নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে নামলাম। বিল্টু নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল নিয়ে যেতে। কিন্তু তার মুখে এতদিন বাদে মা-বাবাকে দেখে আনন্দের লেশমাত্র ফুটল না। কঠিন হাসিহীন মুখ। ওর বাবা গাড়িতে সামনে ওর পাশের সিটে উঠতে যাচ্ছিল, বিল্টু কঠিন গলায় বলল, তুমি পিছনে গিয়ে মায়ের পাশে বোসো। সারা রাস্তা আমি আর সুস্নাত ওর সঙ্গে একটু-আধটু কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। ও খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছিল, যেন খানিকটা অনিচ্ছের সঙ্গে। আমি বুঝে গেলাম আমাদের আমেরিকা বাস সুখের হবে না।

লিলিয়ান ছোটখাটো চেহারার ফুটফুটে সুন্দর একটা মেয়ে।

বেশ হাসিখুশিও। বাড়িতে পৌঁছোনোর পর আমাদের প্রেশার-ট্রেশার দেখল, জেট ল্যাগ কাটানোর জন্য ঘুমের ওষুধ দিল। একটু গল্পও করল বসে। আমার দেওয়া সোনার গয়না পেয়ে ভারী খুশি।

কিন্তু দু'দিন পর থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে লাগল। এক সন্ধেবেলা বিল্টু আমাদের সামনেই স্কচের বোতল খুলে বসে বাপকে অফার করল এবং নিজেও খেতে লাগল। নির্লজ্জ সুস্নাত অবশ্য গায়ে মাখল না, দিব্যি মদ খেতে শুরু করল ছেলের সঙ্গে। এবং তারপরই আচমকা বিল্টু প্রশ্ন করল, তোমরা আমার কেমন মা-বাবা বলো তো? কী করেছ আমার জন্য সারাজীবন তা বলতে পারবে? বলো তো কী করেছ! একটা একটা করে বলো। বলো, বলতে শুরু করো...

আমি চুপ। সুস্নাত কী একটা বলতে যেতেই বিল্টু একটা ধমক দিল, শাট আপ! সেই ধমকে লিলিয়ান অবধি চমকে উঠেছিল।

খানিকক্ষণ অনর্গল বাংলায় আমাদের পিন্ডি চটকে গেল বিল্টু। আমরা যে কতখানি স্বার্থপর, কতখানি সংকীর্ণমনা, কতটা আত্মকেন্দ্রিক এবং কতটা নীতিবোধহীন তারই ফিরিস্তি। একটা অভিযোগও খণ্ডন করার সাধ্য আমাদের ছিল না। সুস্নাত অবশ্য ব্যাপারটাকে ঠাট্টা ইয়ারকির ছলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

তারপর প্রায় প্রতি দিন বিল্টু ফিরলেই মদ খেয়ে একের পর একটা ঘটনা টেনে এনে আমাদের কোণঠাসা করে দিতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, বোধহয় এই জন্যই এত

পয়সা খরচ করে ও আমাদের সে দেশে নিয়ে গেছিল।

তা বলে আমরা কি বেড়াইনি? বেড়িয়েছি। তবে বিল্টু বা লিলিয়ানের সঙ্গে নয়। বিল্টু গাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল। সঙ্গে গাইড ছিল। দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই দেখেছি।

সবচেয়ে বড় ঘা এল এক মাস দশ দিন পর। এই এক মাস দশ দিন আমি কাঁটা হয়ে ছিলাম। তবু বিল্টুর রাগ আমার ওপর ততটা ছিল না, যতটা ছিল ওর বাবার ওপর। কিন্তু সুস্নাতর এইসব অপমান তেমন স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। সে দিব্যি সাইট সিয়িং করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে এবং সন্ধেবেলা নির্লজ্জের মতো মদের গেলাস নিয়ে বিল্টুর মুখোমুখি বসছেও। এইসব নিয়ে আড়ালে কথা হলে বলত, আরে, ও একটু রেগে আছে। ক'দিন যেতে দাও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এক মাস দশ দিন পরে এক সন্ধ্যায় রোজকার মতো আমরা লিভিং রুমে বসেছি। বিল্টু মদ খেতে খেতে একটু একটু করে বেহেড হচ্ছিল। সেদিন বারবার সুস্নাতকে জিজ্ঞেস করছিল, হাউ ডু ইউ লাইক লিলিয়ান? ইজ় শি বিউটিফুল?

সুস্নাত উদ্বুদ্ধ হয়ে, ও ফ্যান্টাস্টিক। বিউটিফুল। শি ইজ এ প্যারাগন অফ বিউটি। এইসব বলে যাচ্ছিল। বোধহয় ছেলেকে খুশি করার জন্যই। বুঝতে পারেনি কী ভুল করতে চলেছে।

হঠাৎ বিল্টু ইংরেজি ছেড়ে সাদা বাংলায় বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, তা হলে ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে বলো তো, ওকে নিয়ে তোমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে? ইউ স্কাউন্ড্রেল!

কথাটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছিল। এত নোংরা কথা যে ছেলে বাপকে বলতে পারে, তা তো কিছুতেই ভাবা

যায় না। তাই বড্ড হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরই লজ্জা, ঘেন্না আর আত্মগ্লানিতে আমার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। লিলিয়ান বাংলা কথাটা বুঝতে পারেনি, ইংরেজিটা বুঝেছে। সে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, হোয়াই আর ইউ কলিং হিম নেমস! আফটার অল হি ইজ ইওর ড্যাড।

আর এই প্রথম, জীবনে প্রথম ভাবের জগৎ থেকে, ঘোর থেকে মাতালের নেশা চটকে যাওয়ার মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল সুস্নাত। প্রথমে হতভম্ব, আর তারপরই আচমকা তার ফরসা মুখচোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তার হাত ঠকঠক করে কেঁপে মদের গেলাসটা পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। সে হাঁ করে প্রাণপণে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েও পারছিল না। উঠতে গিয়ে ফের বসে পড়ল। বাক্যহারা, যন্ত্রস্থ, ভয়ার্ত! এর চেয়ে বিল্টু ওকে লাথি মারলেও সুস্নাতর বোধহয় এত বেশি প্রতিক্রিয়া হত না।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ওকে ধরলাম। বললাম, ওঠো, ঘরে চলো।

খুব দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারল সুস্নাত। খানিকটা আমার ওপর ভর দিয়ে, খানিকটা হেঁটে এবং হিঁচড়ে বেসমেন্টের ঘরে এসে কার্পেটেই গড়িয়ে পড়ে গেল সে। সুস্নাতকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। আর সে কান্না যে এরকম বীভৎস হতে পারে, তাও আমার কল্পনাতেও ছিল না। সে কী কান্না! সমস্ত শরীরে ঢেউ উঠছে, হেঁচকি তুলছে পাগলের মতো আর একটা ভয়ংকর গোঙানির শব্দ শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ওর সুন্দর মুখশ্রী একদম পালটে গেছে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, জিভে

দাঁত বসে রক্ত গড়াচ্ছে মুখ দিয়ে। কাঁদতে কাঁদতেই কার্পেটের ওপরেই বমি করে দিল ও। আমি ওর মাথা শক্ত করে দু'হাতে চেপে ধরে বললাম, প্লিজ, নিজেকে সামলাও। তুমি মরে গেলেও কিন্তু এই অবস্থায় আমি ওদের ডাকতে পারব না। তার চেয়ে বড় পরাজয় আর কিছু হয় না।

মরালিটি বা নৈতিকতা যে কত মূল্যবান তা সুস্নাত বুঝতে পারল কি না জানি না।

সুস্নাত টের না পেলেও আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। যদি ওর মরালিটি থাকত তা হলে বিল্টুর গোপন খাতায় এত নেগেটিভ মার্কিং জমা পড়ত না। বিল্টুর মধ্যেও সাহস হত না বাপের চোখে চোখ রেখে অমন কথা বলার।

সুস্নাতকে নিয়ে আমার সারা রাত জেগে কাটল। সারা রাত কাঁদল সুস্নাত। ভয়ে, লজ্জায়, ঘেন্নায়। সকালে উঠে দেখি ওরা দু'জনেই বেরিয়ে গেছে। লজ্জার মাথা খেয়ে বিল্টুকেই ফোন করে বললাম, আমাদের আর ভাল লাগছে না। আমরা কালকেই ফিরে যেতে চাই।

বিল্টু অনুতপ্ত কি না বুঝলাম না। তবে নরম গলায় বলল, কালকেই! আচ্ছা দেখছি।

পরদিনই একটা ইয়োলো ক্যাব-এ এক বাংলাদেশি ছেলে আমাদের এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিয়ে গেল।

সুস্নাত পালটে গেল ঠিকই। তবে বড্ড দেরি হয়ে গেল ওর।

বছরখানেক আগে রজতদা আমাকে ডেকে বললেন, শোনো, বিল্টু দেশে ফিরে আসছে। পারমানেন্টলি। তোমাদের

পক্ষে খুব সুখের খবর। ছেলে এসে এখানেই সেটল করবে।

ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমার কাছে খবর শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুস্নাত। দু'জনেই ঠিক করে ফেললাম, বাঁচবার জন্য আমাদের পালাতে হবে। বিল্টুর মুখোমুখি হওয়া আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সবটা না হলেও, রজতদাকে ঘটনার কিছুটা খুলে বলতে হল। ব্যথিত হয়ে বললেন, ও ঠিক এরকম নয়। হয়তো প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই তোমাদের অপমান করেছে। ঠিক আছে, তোমরা বাড়ি বিক্রি করে অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। ভয় নেই, আমি ওকে কিছুই বলব না। বিল্টু এ বাড়িতেই থাকতে পারবে।

কাউকে কি একথাটা বলা যায় যে, আমরা আমাদের একটা মাত্র সন্তানের ভয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে এই মফস্‌সল শহরে এসে অজ্ঞাতবাস করছি?

এখন এই ভরসন্ধ্যাবেলা আমি হাপুস নয়নে বসে কাঁদছি। চোখের জল বাঁধ মানছে না কিছুতেই। আমার সামনে মুখোমুখি মধুপর্ণা চুপ করে বসে আছে, তার কোলে খোলা কবিতার খাতা।

অস্ফুট গলায় বললাম, আর একবার পড়ো।

মধুপর্ণা বলল, আপনি কাঁদছেন যে!

কাঁদাবার জন্যই তো লিখেছ। পড়ো মা, আবার পড়ো।

মধুপর্ণা মাথা নুইয়ে পড়ল,

কাঁথামুড়ি বুড়ি তোর, ওই দেখ সম্মুখে সোপান,

বড় উঁচা লাগে।

কেমনে পেরেছি বুড়ি, পুণ্যহীণা, হৃতধর্ম, লাঠিভর দেহজ

বিরাগে?

আমাদের অস্থিগ্রন্থি, হাড়মাস সর্বত্র বেদনা।
আমাদের কীর্তি নাই, সিদ্ধি নাই, নাই সোনাদানা।
এইখানে বসি বুড়ি, সোপানের শোভা দেখি আয়,
আমি বুড়া, তুই বুড়ি, কালনদী বানে ভেসে যায়।

কবিতার মর্ম বা ভাল-মন্দ আমি তত বুঝি না। তাই বললাম, তুমি খুব দুঃখের কবিতা লিখতে ভালবাসো বুঝি?

মুখ নিচু করে হাসল। তারপর বলল, আমার যখন যা মনে আসে তাই লিখি। খুব একটা ভাবি না।

বাবলু

অবশেষে আজ রামানূজকে হারিয়ে দিলাম। রামানুজকে হারানো যত সহজ শোনাল, কাজটা তত সহজ ছিল না। গত এক বছর ধরে যে ক'টা টুর্নামেন্ট খেলেছি, প্রত্যেকটাতে রামানুজের মুখোমুখি পড়লেই হারতে হয়েছে। আর হবে নাই বা কেন? রামানুজ বেঙ্গল খেলে, ক'দিন বাদে ইন্ডিয়াতে হয়তো খেলবে। কলকাতায় গিয়ে বড় কোচের কাছে কোচিং নেয়। আমি শখের খেলুড়ে. বেঙ্গল বা ইন্ডিয়া খেলার কোনও বাসনাই নেই। তবে টেবিল টেনিস খেলতে দারুণ ভাল লাগে বলে নিজে নিজেই নানা শট প্র্যাক্টিস করি। কিন্তু টেবিল টেনিস ছাড়াও আমার নানা দিকে প্রবল কৌতূহল আছে বলে ওটা আমার ধ্যানজ্ঞান নয়। রামানুজকে হারানোটা আমার একটা

চ্যালেঞ্জ ছিল। এই মাত্র। আজ ছিল কলেজ চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনাল। প্রথম দুই গেম ছিল এক-এক। তৃতীয় গেম একুশ-উনিশে জিতেই মনে হল, আজ জিতব। মনে হতেই একটা বাড়তি বিক্রম এসে গিয়েছিল। চার নম্বর গেমটা খুব অল্পের জন্য হেরে গেলাম বটে। কিন্তু পাঁচ নম্বর গেমে রামানুজ হারল একুশ-আটে। হেরে বেশ হতভম্বই লাগছিল ওকে। আমার পিঠ চাপড়ে অবশ্য বলল, ওয়েল প্লেড।

ট্রফি জেতার জন্য নয়, রামানুজকে হারিয়েছি এই ব্যাপারটাতেই গা বেশ গরম হয়ে গেল। কিন্তু রামানুজ আর আমি খুব বন্ধু। টেবিল টেনিসের বাইরে কোনও খাড়াখাড়ি নেই। আমার এক ইয়ার ওপরে পড়লেও তুই-তোকারি সম্পর্ক।

টেবিল টেনিসের এই প্যাশনটা পেয়েছি ভোলাদার কাছ থেকে। ভোলাদা কলেজে খেলত, কলকাতার ওয়াইএমসিএ-তে খেলেছে। আমাদের একটা মস্ত বড় খাওয়ার টেবিল আছে। মাঝে মাঝে ছুটির দুপুরে আমার জেঠতুতো দাদা ভোলা আমাকে তার ওপর টেবিল টেনিসের তালিম দিত। তার জন্য বকুনিও খেতে হয়েছে কম নয়। ভোলাদা আমার ছোট জ্যাঠার ছেলে। আমার চেয়ে আট-নয় বছরের বড়। একটু গম্ভীর আর একটু বিষণ্ণ টাইপের। আমার মতো হুল্লোড়বাজ বা চ্যাংড়া নয়। ভোলাদা এখন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই একটু বাইরের দিকে একখানা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। সেখানে এসি-টেসি ফিট করে, চার-পাঁচটা কমপিউটার নিয়ে কয়েকজন মিলে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে। আমিও একটু একটু শিখছি ভোলাদার কাছে। আমার ফিজিক্স অনার্স। জয়েন্টে গাড্ডু মারায় ফিজিক্স অনার্স

ছাড়া আর পথ ছিল না। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ কী তা আমি বুঝতে পারি না। আমি তো আর বৈজ্ঞানিক হতে পারব না। শেষ অবধি স্কুল বা কলেজে চাকরি করতে হবে। তার চেয়ে বরং সফটওয়্যার ভাল। ভোলাদা আমেরিকা থেকে অর্ডার পায়, হরিয়ানা বা মুম্বই থেকেও পায়। দিব্যি কাজ, দশটা-পাঁচটা নেই।

ট্রফিগুলো আমার ভাই বাচ্চুর হাত দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আজ আমি একটু আড্ডা মারলাম। আমার একটা ভারী ভাল বন্ধুর গ্রুপ আছে। পাঁচটা ছেলে আর চারটে মেয়ে। অফ টাইমে প্রায়ই আমরা মাঠেটাঠে বসে যাই। অন্য বন্ধুরাও এসে জোটে। তবে আমরা নয় জন হলাম কনস্ট্যান্ট। আর্টস সায়েন্স মিলিয়েই আমরা নয়জন। কী করে এই কম্বিনেশনটা হল তা বলতে পারব না। তবে হয়ে গেল। কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার থাকে। ব্যাখ্যা করা যায় না।

মেয়েদের মধ্যে মধুপর্ণাই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। ওর সঙ্গে আমার খুব পট খায়। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক করেও ডাক্তারি পড়তে যায়নি। সব ছেড়ে বাংলা অনার্স পড়তে চলে এসেছে। আমি ওকে বলি, তোর ভবিষ্যৎ হল রান্না আর কান্না। এক হাতে বরের জন্য রান্না করবি, আর অন্য হাতে চোখের জল মুছবি। ডাক্তারিটা পাশ করা থাকলে তবু একটু আপারহ্যান্ড নিতে পারতি। বাংলা অনার্স কেউ ছোঁবেও না। বিয়েই হবে কি না দেখ।

মধুর কবিতা নানা কাগজে বেরোয়। কলকাতার ঘ্যামা কাগজেও। সেসব পড়ে অবশ্য আমি কিছু বুঝতে পারি না।

তবে ছবিটা ও দারুণ আঁকে। বেশির ভাগই স্কেচ। বরাবর 'বসে আঁকো'-তে ফার্স্ট হয়ে আসছে। মধু ডিস্টিংক্টলি একটু অন্যরকম। খেয়ালি, ছন্নছাড়া, পাগলি মতো। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যায় না। মধু কিন্তু প্রয়োজনে ভীষণ শক্ত হতে জানে। কোনও বদমাশ ছেলে সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করলে তুড়ে দেয়।

একটা ভারী মজা হয়েছিল। মধু খুব সুন্দর স্কেচ করতে পারে বলে আমরা ওকে ধরে পড়েছিলাম। ও একে একে আমাদের প্রায় সকলের মুখই একেবারে হুবহু এঁকে দিল। অল্প কয়েকটা টানে কী করে যে আঁকল, যেন ম্যাজিক। কিন্তু সবার শেষে যখন আমার মুখ আঁকল, তখন আমি দেখলাম মুখটা একদম আমার মতো হয়নি। সবাই বলল, না, বাবলুর মুখটাই হয়নি। আর সবগুলো ভীষণ ভাল হয়েছে।

মধু গম্ভীর হয়ে বলল, হয়নি বুঝি?

আমি বললাম, দূর! এ তো আমার মুখ নয়। তবে চেনা চেনা লাগছে।

মধু ফস করে কাগজটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কুচি কুচি করে।

আমি বললাম, রাগ করছিস কেন? আমারটা মন দিয়ে আঁকিসনি, তাই তো বলছি।

মধু রাগ করে বলল, তোর মুখটা ডিফেকটিভ।

শাশ্বতী বলল, ঠিক বলেছিস। আসলে বাবলুটা তো দেখতে কমেডিয়ানের মতো। কিন্তু তুই ওকে একটু মায়া করিস বলে মুখটা বড় বেশি সুন্দর করে ফেলেছিস। বাবলু তো অত সুন্দর নয়।

আমি বুক চিতিয়ে বললাম, সুন্দর হোক, কুচ্ছিত হোক, আমার মুখ আমারই মুখ। অ্যান্ড আই অ্যাম প্রাউড অফ ইট। তুই আঁকতে পারিস না, তাই বল।

মধু কিন্তু ভুলেও আর আমার মুখ আঁকার চেষ্টা করেনি। কিন্তু মুখটা আমার চেনা চেনা ঠেকল কেন? সেটাই বুঝতে পারলাম না। আমার মুখ নয়। সেটা নিশ্চিত। কিন্তু বেশ চেনা মুখ।

কলকাতার জিমি'জ কিচেনের নাম নকল করে এ শহরে একটা রিমি'জ কিচেন নামে রেস্তরাঁ খুলেছে। এসি আছে, নরম আলো, সফট মিউজিক, আমার অনারে আজ বন্ধুরা আমাকে রিমি'জ কিচেনে চাঁদা করে খাওয়াল। রামানুজকে হারানো তো সোজা ব্যাপার নয়।

আজকাল আমরা সবাই মোটামুটি ক্যালোরি-সচেতন বলে গোগ্রাসে খাই না। বেছেগুছে মেপেজুখে খাই। মেয়েরাও চিমসে থাকার জন্য আর লিপস্টিক বাঁচানোর জন্য পছন্দের খাওয়া-দাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। শুধু ফুচকার বেলায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমার বাড়ির ব্যবস্থা আবার আলাদা রকমের। বাড়িতে আমার অন্তত সাত-আট জন গার্জিয়ান। বাইরে থেকে পেটভরে খেয়ে গেলে প্রত্যেকের কাছে আলাদা করে জবাবদিহি করতে হবে। দিনের মধ্যে যে কতবার কতজনার কাছে কত রকম বকুনি খেতে হয়, তার হিসেব নেই। মা বাবা, দুই জ্যাঠা এবং দুই জেঠি ছাড়াও কয়েকজন দাদা ও দিদি। সব মিলিয়ে আমার অবস্থা বেশ করুণ। তবে এও বলতে হয়, অনেকদিন পর্যন্ত কে আমার বাবা-মা সেটাই বোঝা যেত না। কখনও বড়মার কাছে

গিয়ে রাতে ঘুমিয়ে থাকছি, কখনও ছোটমার আঁচল চাপা হয়ে কোলে চড়ে ঘুরছি, কখনও মায়ের কাছে ঠোকনা খাচ্ছি। মা-বাবার চেয়ে বড়মা আর ছোটমার কাছেই লাই পেয়েছি বেশি। এখনও ব্যাপারটা একই রকম রয়ে গেছে।

পার্টি শেষ হওয়ার পর বেরোবার সময় মধুপর্ণা বলল, এই, তুই আমাকে একটু এগিয়ে দিবি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কী রে! এগিয়ে দেব মানে? তুই কি অবলা নাকি? না কি কেউ পিছুতে লেগেছে?

ধ্যেৎ! চল না, একটু গল্প করতে করতে হাঁটি।

দূর! আমি সাইকেলে বাঁই করে বেরিয়ে যাব। তোর সঙ্গে টিকিস টিকিস করে হাঁটতে যাব কেন?

চল না বাবা।

শাশ্বতী বলল, মধুর এখন সত্যিই একজন চলনদার দরকার রে বাবলু। জানিস তো, নন্দন ওকে দেখে নেবে বলে শাসিয়ে রেখেছে।

আমি হা হা করে হেসে বললাম, নন্দন শাসিয়েছে? এই তো দিন চারেক আগে কালীবাড়ির চত্বরে বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে খুব ইংরেজি ফোটাচ্ছিল বলে নগেন বাঁড়ুজ্জে ওকে ছাতাপেটা করতে গিয়েছিল। অন্য বুড়োরা ধরে ফেলেছিল, তাই। শেষে পালিয়ে বাঁচে।

মধু বলল, কেন বাজে কথা বলছিস! আমি কাউকে ভয় পাই না।

কথাটা ঠিক। এই একটা কারণে মধুপর্ণাকে আমি বন্ধু হয়েও শ্রদ্ধা করি। মধুর ভয়ডর খুব কম। দেখতে নরম-সরম হলেও,

ওর ভিতর ইস্পাতের মতো একটা মেরুদণ্ড আছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। চল। তবে কদমতলার মোড় অবধি। তারপর আমি ডান ধারে যাব। পাড়ায় আজ পুজোর মিটিং আছে। না গেলে কথা উঠবে। আমি আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।

মধুপর্ণা রাগ করে বলে, অত কাঁড়া কাটতে হবে না তো! গেলে যাবি, না গেলে না যাবি, অত কথা কীসের? তুই যে পাড়ার একজন ইম্পর্ট্যান্ট লোক, সেটা আর জাহির করতে হবে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, চল।

কিছুদূর পর্যন্ত দল বেঁধে হাঁটার পর একে একে যে যার কেটে যেতে লাগল। মনোহারী বিপণির কাছ বরাবর অনিন্দিতা রিকশায় উঠে গেল। তারপর আমি আর মধুপর্ণা।

মধু বলল, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে ছুতো খুঁজছিলাম।

বলে ফেল।

তুই কি তানিয়াদের বাড়িতে যাস না?

তানিয়াদের বাড়ি? দূর! ওদের বাড়িতে যাব কেন?

তুই কী রে! কাল তানিয়ার জন্মদিনে নেমন্তন্ন ছিল। তোর খোঁজ করতে তানিয়া ভীষণ লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বলল, বাবলুদা তো আসে না। আমি তো অবাক। তারপর কেন আসে না, রাগারাগি হয়েছে কি না কত জিজ্ঞেস করলাম, কিচ্ছু বলল না। শুধু মুখ নিচু করে হেসে গেল। একটু রাতের দিকে তোর মা আর ছোট জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। আমি মাসিমাকে গিয়ে

জিজ্ঞেস করলাম, বাবলু এল না মাসিমা? মাসিমা বললেন, না না, বাবলু আসবে কী! তার কত কাজ...

তুই একটু বুদ্ধু আছিস। তানিয়াদের বাড়িতে আমি কোনও অকেশনেই যাই না।

এ মাঃ, তা হলে তোদের মধ্যে প্রেমটা হয় কী করে? ফোনে ফোনে?

খেপেছিস! প্রেমটা কোথায় দেখলি? আমাদের মধ্যে প্রেম আছে, একথা কি তোকে আমি বলেছি?

না বললেও কি বুঝে নেওয়া যায় না?

সেই জন্যই তো তুই বুদ্ধু।

আচ্ছা, তানিয়াকে তো তুই বিয়েই করবি!

তা করব। মানে করতে হবে।

প্রেম ছাড়াই বিয়ে করবি বুঝি?

তুই আমাদের ফ্যামিলির সিস্টেম জানিস না তাই বলছিস। ওসব প্রেম-ট্রেম আমাদের পরিবারে বিশেষ নেই। তানিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি বা টেলিফোনে আমার কোনও কথা হয় না। আমি ভুলেও কখনও ওদের বাড়ি যাই না। তবে আমাদের বাড়িতে পালাপার্বণে তানিয়া তার মা-বাবার সঙ্গে আসে। নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যায়। দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

বলিস কী? এ আবার কেমনধারা নিয়ম?

কী করা যাবে বল? আমার যখন আট-নয় বছর বয়স আর তানিয়ার দেড় না দুই, তখনই আমার গার্জিয়ানরা বিয়েটা ঠিক করে ফেলে। অনেকটা বাল্যবিবাহেরই ইমপ্রোভাইজড ফর্ম। তুই জানিস না, আমাদের প্রায় সব ভাইবোনের বিয়েই ঠিক হয়ে আছে।

হঠাৎ দেখলাম মধু আমার দিকে চেয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের পলক ফেলছে না। মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে আর শুকনো দেখাল। ভীষণ অবাক। তারপর যেন খুব হাঁপ ধরা গলায় বলল, সবার বিয়েই ঠিক হয়ে আছে বুঝি?

একরকম তাই। আমার বোন ফুলকে, নিতি, পিতুনদা, কানুদা, রমিকাদি। এদের সবার বিয়েই ঠিকঠাক। কুষ্ঠি-টুষ্ঠি বিচার করে, যোটক মিলিয়ে বুক করে রাখা হয়েছে।

আর এদের মধ্যে যদি কেউ হঠাৎ করে অন্য কারও প্রেমে-ট্রেমে পড়ে যায়, তখন কী হবে?

আমাদের গার্জিয়ানরা তো ইনহিউম্যান নন, লজিক্যাল। সেক্ষেত্রে সবাই মিলে বসে কথা বলে নেবে। জোরালো প্রেম হলে সেটা মেনেও নেওয়া হয়। আমার মেজদা রতনের বেলায় তাই হয়েছিল তো। পুতুলদির সঙ্গে প্রেম হওয়ায় গার্জিয়ানরা বাধা দেননি। রতনদা পুতুল বউদিকে নিয়ে দিল্লিতে ঘরসংসার করছে।

আর যার সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল সেই মেয়েটির কী হল?

তারও বিয়ে হয়ে গেছে। তুই বিশ্বাস করবি না, সেই মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ থেকে শুরু করে মানিটারি হেলপ পর্যন্ত করা হয়েছিল আমাদের পরিবার থেকে। আমার যে-দিদি আমেরিকায় আছে, সে এক লাখ টাকা পাঠিয়েছিল, রতনদা নিজেও দিয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। পিতুনদা অস্ট্রেলিয়ায় আছে, সেও এক লাখ টাকা দিয়েছিল।

তোদের ফ্যামিলিটা দারুণ, না?

হ্যাঁ।

তবে তোরা একটু ক্ল্যানিশ আর সেকেলে।

সে কথাও ঠিক। একটু কড়া নিয়মকানুন আছে বটে, কিন্তু ভীষণ লাভিং ফ্যামিলি। আমার চারটে বউদি আছে, তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি, তারা ভীষণ হ্যাপি। কারও কোনও বিপদ বা সংকট হলে বা অসুখবিসুখ করলে আমাদের পুরো পরিবারটা একদম এককাট্টা হয়ে তার পাশে দাঁড়ায়।

মধু আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, আর কারও বিয়ে ঠিক হয়ে নেই? তুই তো মোটে পাঁচজনের কথা বললি। কিন্তু তোর তো আরও ভাইবোন আছে।

আমি হাসলাম, আর বিশেষ নেই। আমার ছোট জ্যাঠার মেয়ে বিলুর পোলিও হয়েছিল, জানিস তো। একটা পা আর হাত শুকিয়ে গেছে। হয়তো বিয়েই হবে না। ওর অবশ্য মনের খুব জোর। আর বাকি রইল রমুদা আর ভোলাদা। ওদের অবশ্য বিয়ে ঠিক করা নেই।

কেন? ওঁরা বাদ পড়লেন কেন?

বলা মুশকিল। হয়তো পছন্দসই কাউকে পাওয়া যায়নি।

মধুপর্ণার মুখটা হঠাৎ ভীষণ লাল দেখাল কেন কে জানে!

কদমতলার মোড় থেকে আমাদের আলাদা পথে যাওয়ার কথা। কিন্তু হল না। কিছুক্ষণ ধরেই মেঘের গুরুগুরু শব্দ আর বিদ্যুতের ঝলকানি টের পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ মারমার করে হাউড়ে বাতাস এল তেড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তেরছা প্রবল বৃষ্টি।

দৌড়ো! দৌড়ো! বলে এক হাতে সাইকেল, অন্য হাতে মধুর একখানা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ছুটতে ছুটতে

কোনওরকমে মতিরামের অর্ধেক-ওঠা বাড়িটার বারান্দায় উঠে পড়লাম। গায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, দিলি তো আমার প্রোগ্রামটার বারোটা বাজিয়ে! সাইকেলে কখন বাড়ি পৌঁছে যেতাম!

এ মা! বৃষ্টি নামবে তা বুঝি আমি জানতাম!

হঠাৎ তানিয়ার কথা তুলতে গেলি কেন? আর কথা ছিল না?

মারব থাপ্পড়। তানিয়ার কথা তুলব না কেন রে! কী সুন্দর হয়েছে তানিয়া এখন দেখতে! দেখেছিস ইদানীং তানিয়াকে?

মাসখানেক আগে একদিন দেখেছিলাম। স্কুলে যাচ্ছিল। ঝাঁকের মধ্যে।

কথা বলেছিস?

পাগল!

দেখতে সুন্দর না?

সুন্দর হলেই বা কী, কুচ্ছিত হলেই বা কী, কপালে তো ওই আছে।

তোর কপাল ভীষণ ভাল। মাত্র তো চোদ্দো বছর বয়স, এখনই কী দিঘল সুন্দর ফিগার হয়েছে। গায়ের রংখানাই বা কী! আর তেমনি মুখচোখ। তোর তো ষণ্ডাগুন্ডার মতো চেহারা।

দেখ, সৌন্দর্য জিনিসটা স্কিন ডিপ, এটা তোর না জানার কথা তো নয়। রূপ ধুয়ে কেউ জল খায় না। চটকের একটা দাম আছে ঠিকই, তবে সেটা আসল জিনিসের বাহারি মোড়ক মাত্র।

তোর তো অনার্স ফিজিক্সে, ফিলজফিতে তো নয়।

ফিলজফার যে কেউ একটু আধটু হতেই পারে বাবা। ফিলজফার হতে গেলে কোনও কসরত করার দরকার হয় না। আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে বাতাসীর সঙ্গে কথা বলে দেখিস, কীরকম দার্শনিক কথাবার্তা বলে।

মধু একটু হাসল। ভারী আনমনা লাগছিল ওকে। মুডি মেয়ে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার উলটোদিকে মিউনিসিপ্যালিটির চিলড্রেন্স পার্ক। ক'দিন আগেই ঘটা করে পার্কটার উদ্বোধন হল। একজন মিনিস্টারও এসেছিলেন। শুনেছি, বিউটিফিকেশনের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। টাকার শ্রাদ্ধ আর কাকে বলে। ক'দিন পরেই রেলিং-এর লোহা হাপিস হতে থাকবে। দোলনা, স্লিপ, বসার বেঞ্চ সব একে একে হাওয়া হবে, নয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে। দুপুরে বসবে জুয়ার আড্ডা বা পাতাখোরদের জমায়েত। তবে নতুন নতুন পার্কটায় এলে এখন বেশ ভালই লাগে। নানারকম গাছ লাগানো হয়েছে, সরু কংক্রিটের স্ট্রিপ, চমৎকার পুরু ঘাসের জমি। ছোট ছোট বাতিস্তম্ভ। বৃষ্টিতে এখন সবকিছুই আবছা। হঠাৎ মধুপর্ণা বলে উঠল, এই বাবলু, দেখ বৃষ্টির মধ্যে একটা লোক পার্কে বসে আছে!

কোথায় লোক?

ওই যে দেখ না! ডানধারে ঝোপটার আড়ালে।

দূর! বাতাসে গাছপালা নড়ছে।

না রে, একটা লোক।

একটু বাদে লোকটাকে আমিও দেখতে পেলাম। একটা বেঞ্চে একটু কোনা ঘেঁষে একটা লোকই বটে। তার মাথায় ছাতা নেই, এই প্রবল বৃষ্টিতে পাগল ছাড়া ওরকমভাবে কে বসে থাকবে! বাজ পড়ে কেউ মারা-টারা গেল নাকি?

বললাম, দাঁড়া তো, একটু দেখে আসি।

না, একা নয়, আমিও যাব তোর সঙ্গে।

খেপেছিস! তোর ঠান্ডা লেগে যাবে। আমি একছুটে দেখে আসছি দাঁড়া।

মধু অবশ্য কথা শোনার পাত্রী নয়। ঠিক এল সঙ্গে সঙ্গে। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর প্রলয়ের বাতাস ভেদ করে কাছে গিয়ে দেখি, কোনও মৃতদেহ নয়, একজন জ্যান্ত লোক। আর লোকটা গোলোকবিহারী। পাশেই ঘাসজমিতে কেতরে পড়ে আছে তার লগবগে পুরনো সাইকেলখানা।

গোলোককাকা, কী করছেন এখানে বসে?

গোলোকবিহারী এই প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় আমাদের চিনতে পারলেন না বোধহয়। মিটমিট করে তাকাচ্ছেন।

উঠুন, বাড়ি যান। এই বৃষ্টিতে বসে থাকলে অসুখে পড়বেন যে!

গোলোকবিহারীর মাথার চুল নেমে পড়েছে কপালে। সর্বাঙ্গ ভেজা স্যাঁতা ঠান্ডা। মজবুত মানুষ নন, নিউমোনিয়া হতে কতক্ষণ?

মধুপর্ণার চোখ আমার চেয়েও ভাল, বলল, দেখ, ভদ্রলোকের মাথায় আর গায়ে চোট। বাঁ-পাশে মাথা ফুলে আছে, বাঁ-গালে অনেকটা কেটে গেছে।

গোলোকবিহারী কথা কইতে পারছিলেন না। আমি আর মধু দু'দিকে ধরে বেশ কষ্টে তুলে দাঁড় করালাম। গোলোকবিহারী বাধা দিলেন না, কিন্তু দেখলাম, হাঁটতে পারছেন না। বোধহয় হাঁটুতে চোট।

পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন নাকি কাকু?

জবাব পাওয়া গেল না। ধরে ধরে এনে মতিরামের বারান্দায় হ্যাঁচলা বাঁচিয়ে বসালাম। আমাদের অগতির গতি ভোলাদা। লোকের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সুনাম আছে আমাদের পরিবারের। ব্যাপারটা জেনেটিক। তার মধ্যে আবার ভোলাদা হল এক নম্বর। জন্তিবুড়ি নামে একটা বুড়ি ভিখিরি ছিল। রিকশার ধাক্কায় তার কোমর ভেঙে যায়। ভোলাদা নার্সিং হোমে রেখে তার চিকিৎসা করিয়েছিল। জন্তি বাঁচেনি। ভোলাদা লোক জড়ো করে নিজে খাটে কাঁধ দিয়ে নিয়ে দাহ করে আসে।

বোধিসত্ত্বর বাড়ি গোলোকবিহারীদের বাড়ির পাশেই। বোধি বলে, গোলোকবাবুকে নাকি তার বউ আর দুই মেয়ে প্রায়ই মারধর করে। হয় সেটা, না হয় সাইকেল থেকে পড়ে চোট হয়েছে।

মোবাইলটা বের করে ভোলাদাকে ফোন করতে গিয়ে দেখি, মোবাইলটা গেছে। জল-টল ঢুকে একদম বরবাদ। দামি সেট, মাত্র মাস তিনেক আগে কিনেছিলাম।

মধু, তোর তো মোবাইল নেই, না?

না। কেন কাকে ফোন করবি?

ভোলাদাকে। এ কেস ভোলাদা ছাড়া কেউ হ্যান্ডেল করতে পারবে না।

এই প্রতিকূল অবস্থাতেও মধুপর্ণা ঠাট্টা করে বলল, ভোলাদা কি সুপারম্যান নাকি?

বাজে বকিস না। ভোলাদা সুপারম্যান না হলেও আ ম্যান ইন হিজ ট্রু এলিমেন্টস। অলক লাহিড়ির নাম বললে সবাই মাথা নোয়ায়। তুই দাঁড়া, আমি কদমতলার মোড় থেকে ভোলাদাকে ফোন করে আসছি।

তার চেয়ে ভদ্রলোককে একটা রিকশায় তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।

তা হয়। কিন্তু বাড়িতে যদি ঝগড়া করে এসে থাকে তা হলে?

রাগ কি আর এতক্ষণ থাকে! এখন নিশ্চয়ই তারাও খুঁজতে বেরিয়েছে।

বৃষ্টির রোখটা একটু কমেছে। মধুর কথাটা আমার যুক্তিযুক্তই মনে হল। মোড় থেকে একটা রিকশা ডেকে আনলাম। রিকশাওয়ালা ফটিক। চেনা ছেলে। পয়সা দিয়ে বললাম, একদম ঘরে ঢুকিয়ে আসবি কিন্তু।

ফটিক বলল, ঠিক আছে। এ তো ছোনেদার বাবা!

বললাম, হ্যাঁ।

আমি গিয়ে পার্ক থেকে গোলোকবিহারীর সাইকেলটা নিয়ে এসে মধুপর্ণাকে বললাম, রাত হয়েছে রে, তুই রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যা।

কিন্তু তোর কী হবে?

আমার জন্য ভাবছিস কেন? এখান থেকে তো বেশিদূর নয়। তুই কিন্তু খুব ভিজেছিস। তোর অমন আমার পিছু-পিছু

যাওয়ার দরকার ছিল না। মাসিমা জানতে পারলে আমাকে বকবে।

ঠিক উলটোটা। মা বা বাবার অন্ধ বিশ্বাস, লাহিড়িবাড়ির ছেলে বা মেয়েরা দেবদূত।

আমি হেসে বললাম, অন্ধ বিশ্বাস মানে?

মানে ধারণাটা যে কত ভুল।

মারব থাপ্পড়। চাস তো এগিয়ে দিতেও পারি।

দরকার নেই। আমি অবলা নই। তুই দয়া করে বাড়ি যা।

মধুকে রিকশায় তুলে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরতে লাগলাম, দুটো সাইকেল ঠেলে। গোলোকবিহারীর সাইকেলটা ওঁর রিকশায় তুলে দিলেও হত। কিন্তু গোলোকবাবু একটা ঘোরের মধ্যে আছেন, সাইকেলটা হয়তো সামলাতে পারতেন না।

ইস্কুলে ছোনে আমাদের কয়েক ক্লাস ওপরে পড়ত। তখনই মারপিট করে করে হাড় পেকে গিয়েছিল ওর। জুয়া খেলত, মদ খেত। শেষ অবধি ইস্কুল থেকে টিসি ধরিয়ে দেওয়া হয়। দু'-একবার জেল-টেলও খাটল। আর তারপরই হাইওয়েতে লরি থামিয়ে তোলা আদায়ে নেমে পড়ল। লোকের মুখে শুনি ছোনে এখন পেশাদার গুন্ডা। আমার রমুদা ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার। তার কাছে ছোনেকে মাঝে মাঝে এসে ধর্না দিতে দেখেছি। এ ছাড়া ছোনে সম্পর্কে আমার আর কিছুই জানা নেই। জানার দরকারটাই বা কী? চন্দ্র-সূর্য যতদিন আছে গুন্ডা-মস্তানরাও থাকবে। শুধু বেচারা গোলোকবিহারী গুন্ডার বাবা হয়েই রয়ে গেলেন, তেজবীর্যের বালাই নেই।

বাড়িতে ফিরেই বড়মা'র পাল্লায় পড়তে হল। বড়মা অর্থাৎ

আমার বড় জ্যাঠাইমার সবসময়ে ভয়, এই বুঝি ছেলেপুলেদের ঠান্ডা লেগে গেল। ওরে, বৃষ্টিতে ভিজিসনি, আইসক্রিম খাসনি, জানলা বন্ধ কর, বাঁদুরে টুপি পর। তাই যেই বড়মার শাসনে পড়লাম, হাতে পায়ে গরম তেল মালিশ করতে হল, একটু সেঁকতাপও নিতে হল, নাক্সভমিকা খেতে হল।

তারপর মধুপর্ণাকে ফোন করলাম, ফিরে হাঁচি-ফাঁচি শুরু হয়েছে নাকি?

না, তোর?

আমারও কিছু হয়নি। মাসিমা কিছু বলল?

একটু চিন্তা করছিল, তোর নাম বলতেই জল। তারপর গোলোকজ্যাঠার ঘটনাটাও বললাম। শুনে চোখ ছলছল করতে লাগল। গোলোকবাবুকে দেখলেই নাকি মায়ের কেবল তার বাবার কথা মনে পড়ে।

চেহারার মিল আছে বুঝি?

আরে দূর! আমার দাদু খুব একটা লম্বা নয় ঠিকই, কিন্তু হ্যান্ডসাম! ফরসা, গোলগাল। তবে যে-কোনও বুড়োমানুষকে দেখলেই মায়ের বাবার কথা মনে পড়বেই। ওটা একটা অবসেশন। তোর মোবাইলটার কী খবর?

আর বলিস না। সাত হাজার টাকায় কিনেছিলাম। মনে হচ্ছে দেহ রেখেছে। চালু করা গেলেও অনেক খরচা পড়ে যাবে। তার চেয়ে নতুন সেট কেনা ভাল। তবে একবার ভোলাদাকে দেখিয়ে নেব। পারলে ভোলাদাই পারবে।

মধুপর্ণা মিষ্টি করে একটু হেসে বলে, তোর অবসেশন হচ্ছে ভোলাদা। ভোলাদা বুঝি সবকিছু পারে?

তা নয়। তবে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের কমন সেন্স প্রবল হয়। ফলে অনেক সময়ে ডিফেক্টটা বের করে ফেলে। ওর পাঁচটা কমপিউটার। মিস্তিরি-ফিস্তিরি ডাকে না। প্রবলেম হলে নিজেই খুলে-টুলে সারিয়ে নেয়।

মধুপর্ণার পর বোধিসত্ত্বকে ফোন করলাম।

বোধি, গোলোকজ্যাঠার খবর কিছু জানিস?

হ্যাঁ, সাংঘাতিক ব্যাপার।

কেন রে, কী হয়েছে?

গোলোকবাবুর স্ত্রী আজ সন্ধেবেলা হঠাৎ মারা গেছেন।

তাই নাকি? ওঃ, সে জন্যই লোকটা গিয়ে চিলড্রেন্স পার্কে বৃষ্টির মধ্যে বসে ছিল। কীভাবে মারা গেল বল তো!

অদ্ভুত ঘটনা মাইরি। সন্ধেবেলা আজ ওদের বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল। রোজই হয়। আজ গোলোকবাবুকে ওর বউ আর বড় মেয়ে বেদম পিটিয়েছে। টাকাপয়সা নিয়েই ওদের লাগে। শেষ অবধি শুনলাম, গোলোকবাবুর বউ ভদ্রলোককে মাটিতে ফেলে একটা শাবল নিয়ে ওকে মারতে উঠেছিলেন।

বাপ রে! তারপর?

ঠিক সেই সময়ে ভদ্রমহিলার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান উনি।

সাংঘাতিক কেস তো!

শাবলটা বসালে কিন্তু গোলোকবাবুরই মারা যাওয়ার কথা। পাড়ায় তো ঘটনাটা নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে। ঘটনার সময়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকেই সেখানে ছিল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, গোলোকবাবু সজ্জন কি না জানি

না। কিন্তু নির্বিরোধী মানুষ। শুধু যথেষ্ট টাকাপয়সা অর্জন করতে না পারাটাই ওঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ। ওঁর স্ত্রীর হঠাৎ সময়মতো হার্ট অ্যাটাক হওয়া আর ওঁর বেঁচে যাওয়াটা কি দৈবকৃপা? কে জানে বাবা!

রাতে শুতে যাওয়ার সময় আজ হঠাৎ তানিয়ার কথা মনে হল। তার কারণ বোধহয় মধুপর্ণা। তানিয়ার সঙ্গে আমার প্রেম হচ্ছে কি না জানতে চাইছিল। মধু একটা বদ্ধ পাগল। তানিয়ার বয়স সবে চোদ্দো হল! ওই পুঁচকে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম আবার কী? এখনও ফ্রক পরে ডবল বিনুনি ঝুলিয়ে ধেই ধেই করে এক্কা-দোক্কা খেলে। মধুটা যেন কী!

মধুর কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ আচম্বিতে একটা ঘটনা মনে পড়ায় আমি সোজা হয়ে বসলাম। তাই তো! আমার স্কেচ আঁকতে গিয়ে মধুপর্ণা আর একটা মুখ এঁকে ফেলেছিল। সেই মুখটা আমার নয়, অন্য একজনের। তখন মুখটা ঠিক চিনতে পারিনি, তবে খুব চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। এখন আচমকা সত্যটা ধরা পড়ে গেল। মুখটা ভোলাদার। কিন্তু তা কী করে হয়! আমার সঙ্গে কি ভোলাদার মুখের কোনও মিল আছে? আমার মুখটা একটু থ্যাবড়া মতো, ভোলাদার মুখ সেরকম নয়। জিমন্যাস্টিক্স আর ব্যায়াম করে, সেই সঙ্গে ব্যাপক ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা আর দৌড়ঝাঁপ করার ফলেই বোধহয় আমার মুখে একটু কর্কশ ভাব আছে। তেমন লাবণ্য নেই। আমার দাদাটির চেহারায় ধ্যানী বুদ্ধের মতো একটা ভাব আছে। সবসময়ে যেন একটা ভাবের মধ্যে থাকে। একটু মেলানকলিক। অনসূয়াদিদি ওকে আমেরিকায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু

ধরে রাখতে পারেনি। দু'বছর পর একরকম জোর করেই চলে আসে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি ওইরকম একটা ঘ্যামা দেশে থাকতে পারলে না কেন বলো তো? আমি গেলে তো একদম শেকড় গেড়ে বসে যাব। মৃদু মৃদু হেসে বলেছিল, তোকে দেখে তাই মনে হয়। তুই পারবি। আমি পারিনি। আমি বোধহয় একটু হোমসিক আছি। আমি তখন বললাম, দেখো ভোলাদা, হোমের আইডিয়াটাই একটা ক্লিশে। মানুষ তো চিরকালই মাইগ্রেশন করে এসেছে, এখনও করছে। চিনাদের দেখো, মেনল্যান্ড ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে ওরা। নতুন জায়গায় গিয়েও মানুষ নিজের 'হোম' তৈরি করে নেয়, তাই না? গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলেছিল, ঠিক কথা। কিন্তু আমি পারিনি। এই বাড়ি, এই শহর আর এইসব মানুষজনের কথা এত মনে পড়ছে যে, কিছুতেই বিদেশকে স্বদেশ করা হল না।

আমি মাঝে মাঝে বলি, ভোলাদা, তুমি হলে এই বাড়ির ব্লু-আইড বয়।

দূর! কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

অস্বীকার করে লাভ নেই দাদা। এ বাড়ির সবাই জেনে গেছে যে, পুরো ফ্যামিলিটাই একচোখা এবং পার্শিয়াল। পরশুদিন সন্ধে আটটার সময় তুমি বড়মার কাছে পাটপাতার বড়ার কথা বলেছিলে। বড়মা সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীকে পাঠাল পাটপাতা জোগাড় করে আনতে। মাইন্ড ইট, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। আর বিনোদিনীরও বলিহারি যেতে হয়। হাজার ঢুঁড়ে পাটপাতা না পেয়ে সে সূর্যনগরে তার কোন ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে

সেই রাতে তাদের বাগান থেকে পাটপাতা তুলে নিয়ে এল। কী না তোমার পাটপাতার বড়া খাওয়ার মৃদু ইচ্ছে হয়েছে। আরও শুনবে? মাসখানেক আগে তুমি একদিন সন্ধেবেলা দুটো হাঁচি দিয়েছিলে, আর মাথা ধরেছে বলে কপাল টিপে বসেছিলে। তাতে সারা বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। থার্মোমিটার বেরিয়ে পড়ল; হট ওয়াটার ব্যাগে গরম জল ভরা হল, বড়মা আর আমার মা গরম তেল নিয়ে বসে গেল বুকে পিঠে মালিশ করতে। মনে আছে?

ভোলাদা মিটিমিটি হেসে বলে, কাকিমা-জেঠিমারা তো এরকম সবার জন্যই করে।

বাজে বোকো না। বড় জ্যাঠাকে আমরা সবাই যমের মতো ভয় খাই, পারতপক্ষে তাঁর মুখোমুখি হই না, তাঁর ছেড়ে রাখা চটিজোড়ায় পর্যন্ত পা লাগলে প্রণাম করি। আর সেই বড় জ্যাঠাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দুপুরবেলা করে একটা পুরনো ছেঁড়া গেঞ্জি জোগাড় করে তোমার মোটরবাইকটা উবু হয়ে বসে খুব স্নেহের সঙ্গে মুছছেন। অথচ আমরা সবাই জানি বড় জ্যাঠা মোটরবাইক জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারেন না। ঠিক কি না বলো?

আরে ছিঃ ছিঃ! আগে বলবি তো, তা হলে জ্যাঠাকে বারণ করতাম।

করে লাভ নেই। তুমি হলে সকলের নয়নের মণি। এই তো সেদিন পবনকে বলেছিলাম, কলেজের তাড়া আছে, ইস্তিরিওয়ালা রঘুর কাছ থেকে যেন দয়া করে আমার জামা আর প্যান্টটা এনে দেয়। রি-অ্যাকশন কী হল জানো? পবনের

মতো নিরীহ ছেলেও একটা ঝাপটা মেরে বলল, এখন আমি ভোলাদাদাবাবুর জন্য গন্ধলেবু আনতে বাজারে যাচ্ছি, এখন সময় হবে না! খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, তুমি মোটেই পবনকে লেবু আনতে বলোনি। তুমি কার কাছে যেন লেবুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে মাত্র, পবন সেটা ওভারহিয়ার করেছিল। এরপর তুমি কী বলতে চাও?

বলতে চাই, তুই একটা বিচ্ছু ছেলে।

তাও তো মাত্র দু'-চারটে উদাহরণ দিলাম। এরকম অজস্র উদাহরণ আমার কাছে আছে। আমি জানতে চাই, তুমি কীভাবে বাড়ির সবক'টা লোককে হিপনোটাইজ করে রেখেছ? ফুলকে সেদিন কী বলছিল জানো? পরীক্ষা দিয়ে এসে বলল, আজ সকালে উঠে প্রথম ভোলাদার মুখ দেখেছি তো, তাই হিস্ট্রি পরীক্ষাটা ভাল হয়েছে। এরপর তোমার কোনও ওজর আপত্তি চলে না।

তুই বড্ড ফাজিল হয়েছিস।

তোমার ম্যাজিকটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ো। আমি তোমার মতো হওয়ার অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। কিচ্ছু হয়নি, ক্যারিকেচার হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রতন্ত্র না জানলে তোমার মতো হওয়া অসম্ভব।

ভোলাদা হেসে বেদম হয়ে পড়ল। বলল, হিংসুটি হয়েছিস নাকি?

আমার এই শান্ত, বিষণ্ণ, স্থিতধী ও সম্মোহক দাদাটিকে নিয়ে আমাদের কিন্তু বিপদও আছে। সম্মোহনের জালটা যে শুধু বাড়ির লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী এবং পরিচিত

মহলের ওপরেই বিস্তৃত রয়েছে তাই তো নয়। এই সম্মোহন বিপজ্জনকভাবে বিস্তার লাভ করেছে কিশোরী ও যুবতীদের ওপরেও। ফলে অলক লাহিড়ির উদ্দেশে লেখা গাদা গাদা প্রেমপত্র বহুদিন ধরে আমাদের লেটার বক্সে প্রায় প্রত্যেক দিনই জমা পড়ে আসছে। এ কথাও ঠিক যে, এই উদাসীন লোকটি এইসব প্রেমপত্রের দিকে একবার মাত্র সস্নেহ ভ্রূক্ষেপ করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিয়মিত বিসর্জন দিয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যাপারটা সবসময়ে ভীরু প্রেমপত্রের চৌকাঠেই থেমে থাকে না। ব্যক্তিগত আত্মনিবেদন বা আত্মবিসর্জনের মতো সাহসী পদক্ষেপও নিয়ে থাকে। আর ঝামেলা সেটা নিয়েই। আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স, তখন গৌরীদির পাগলামি নিয়ে আমাদের বাড়িতে বিস্তর আলোড়ন হয়েছিল। বিশাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক ধরণী মিত্রের মেয়ে গৌরীদি অলক লাহিড়ির জন্য এমন উন্মাদ হল যে, শেষ অবধি তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য দিল্লি বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার আগে অবশ্য ধরণী মিত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করেছিলেন এ বাড়িতে। অবিশ্বাস্য টাকা বরপণ দিতে চেয়েছিলেন। ধরণী মিত্রের স্ত্রী ছোটমা আর বড় জ্যাঠার কাছে কম ধর্না দেননি। সে এক বিশাল অশান্তি। বছর দুই বাদে বর্ণালী রায় নামে মেয়ে-কলেজের একজন অধ্যাপিকা প্রায় একই রকম আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তখনও এই শহরে সাইবার কাফে তেমন চালু ছিল না। বর্ণালী রায় আসতেন ইন্টারনেটের কাজ করতে। এমনিতে গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা, ছাত্রীরা সমীহ করত তাঁকে। কিন্তু প্রেমে

পড়ার পর এমন লাজলজ্জা ভুললেন যে আমরা হতবাক। দিনের মধ্যে কতবার যে এসে হানা দিতেন তার ঠিক নেই। আমার অসহায় দাদাটি আত্মরক্ষার জন্য অবশেষে কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিতে পাহাড়ে চলে যায়। তৃতীয় ঘটনাটি করুণ ও মর্মান্তিক। শর্বরী সেন ছিল ভারী শান্ত, ধীরস্থির, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। মাধ্যমিকে দারুণ রেজাল্ট করেছিল। দেখতে সুন্দরী ছিল না ঠিকই, কিন্তু তেমন হ্যাক ছিঃ-ও নয়। কমপিউটর শিখতে এসে এমন সম্মোহনে পড়ে যায় যে, আর বেরোতেই পারল না।

কিন্তু শর্বরীর বাবা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মেয়ে প্রেমে পড়েছে শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে শাসন তর্জন এবং পরে মারধরও শুরু করেন। সম্ভবত বাবার ওপর তীব্র অভিমানেই শেষে সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

মধুপর্ণার সঙ্গে দেখা হল ফিফ্‌থ পিরিয়ডে। চারজন বিকেসি-র ক্লাস কেটে ফুচকা খেতে যাচ্ছে। আমাকেও বলল, যাবি?

চোখ পাকিয়ে বললাম, তোদের মতো বাংলা অনার্স নাকি? আমার এখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে।

শাশ্বতী নাক সিঁটকে বলে, তোদের ল্যাবরেটরি থেকে যা পচা ডিমের গন্ধ বেরোয় না! কী করে সহ্য করিস রে?

এ তো আর ক্যান্টিন নয় যে, ওমলেটের গন্ধ বেরোবে।

চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ মধু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর মোবাইল ঠিক হয়ে গেছে?

কেন ঠিক হবে না?

মধু একটু মিচকে হাসি হেসে চলে গেল। চেঁচিয়ে বললাম, ক্লাসের পর থাকিস, কথা আছে।

ক্লাসের পর একটু ফুটবল পেটাপেটি করে ফিরছিলাম।

কিট-টিট গুছিয়ে যখন সাইকেল নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, তখন দেখি কলেজের গেটে মধু দাঁড়িয়ে আছে, একা।

কী রে, দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়!

তোর জন্য। তুই-ই তো থাকতে বললি!

ওঃ হ্যাঁ, একদম মনে ছিল না।

তা হলে নিশ্চয়ই সিরিয়াস কথা নয়।

আসলে কাল রাতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। তোকে নিয়েই।

কী কথা বল তো?

তুই একদিন আমার মুখের একটা স্কেচ এঁকেছিলি, মনে আছে?

হুঁ।

সকলের মুখ হুবহু এঁকে দিয়েছিলি, শুধু আমার মুখটাই ঠিকঠাক হয়নি। তুই বলেছিলি আমার মুখটা ডিফেকটিভ। মনে আছে?

হুঁ।

কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, মুখটা আমার মতো না হলেও, আর একজনের মুখের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল। আমি তাই ভীষণ অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এটা কী করে সম্ভব হল! যার মুখ তুই এঁকেছিলি সে তো তখন তোর সামনেও ছিল না! আর আমার মুখের সঙ্গে তার মুখের কোনও আদলও নেই।

মধুপর্ণা কোনও কথা বলল না। ফিরে চেয়ে দেখলাম, ওর মুখটা টকটক করছে লাল। চোখ বুজে যেন শক্ত হয়ে আছে। হঠাৎ ওর কী হল বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, এই মধু! কী হল তোর?

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল মধুপর্ণার। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ ঠান্ডা গলাতেই বলল, কিছু হয়নি তো!

শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না, ঠিক আছে। তুই বাড়ি যা।

আমি তবু সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। মধুপর্ণা ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়। একটু আলাদা, অন্যরকম। কিন্তু কীরকম সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আর সত্যি কথা বলতে কী, ওর সঙ্গে তুই-তোকারি বা ঠাট্টা-ইয়ারকির সম্পর্ক হলেও মনে মনে আমি ওকে একটু সমীহও করি। ছবির প্রসঙ্গটা ফের তুলতে তাই সাহস হল না।

কিন্তু মনে মনে খটকাটা থেকেই গেল। আমার মুখ আঁকতে গিয়ে কী করে মধুপর্ণা অলক লাহিড়ির মুখ এঁকে ফেলল? মধু চলে যাওয়ার পরেও আমার মাথার ভিতরে কিছু অসংলগ্ন চিন্তার খড়কুটো উড়ছিল।

বিশুর দোকানে গোলোককাকার সাইকেলটা সারাতে দিয়েছিলাম। চাকা পাংচার, হ্যান্ডেলে টাল, চাকার রিম বেঁকে গেছে, ব্রেক ধরছে না, সিট নড়বড় করছে, একটা মাডগার্ড হাওয়া। এই বিপজ্জনক সাইকেলটি নিয়ে গোলোকবিহারী কীভাবে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তা ভাবলে ভয় করে।

বিশু অবশ্য ভালই সারিয়েছে। বলল, মেনটেনেন্স নেই বটে, কিন্তু সাইকেলটা পুরনো বিএসএ। ছ্যাঁচা বডি।

সাইকেলটা পৌঁছে দিতে শহরতলির ছন্নছাড়া কলোনি এলাকার কাছ ঘেঁষে সন্ধের মুখে মুখে গোলোকবিহারীর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, একখানা ঘরে ছোট্ট একটা কম পাওয়ারের ডুম জ্বলছে, বাদবাকি বাড়ি অন্ধকার। গোলোককাকার নাম ধরে ডাকতেই মালবিকাদি বেরিয়ে এল। বয়স ত্রিশ-ট্রিশ হবে, বিয়ে হয়নি। রোগা, কালো চেহারা।

আয়, ভিতরে এসে বোস।

গোলোককাকা নেই?

শুয়ে আছে। শরীর ভাল নেই, জ্বর হয়েছে।

কাল খুব ভিজেছেন উনি।

ওইসব পাগলামি তো করে বেড়ায়। সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রেখে দে।

কাকিমার কাজকর্ম সব মিটে গেছে?

হ্যাঁ। কাল রাতেই। পাড়ার ছেলেরাই সব করেছে।

ছোনেদাকে খবর দাওনি?

তাকে পাব কোথায়? শহরেই নাকি নেই।

সমস্ত বাড়িটাতে দারিদ্রের দাঁত-নখ বেরিয়ে আছে। এক ইটের পলেস্তারাহীন দেওয়াল, ওপরে টিন। মেঝেতে সর্বত্র এখনও সিমেন্ট পড়েনি। দুটো মাত্র ঘর আর বারান্দা। একটু উঠোন, খোলার চালের রান্নাঘর। বেআবরু খোলা বাড়ি। কোনও বেড়া-টেড়ার বালাই নেই।

মালবিকাদিরা দুই বোন। সুতনুকাদি বছরখানেক আগে

একজন স্মাগলারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে বলে শুনেছিলাম যেন।

একটু চা খেয়ে যা।

না মালবিকাদি। দেরি হয়ে যাবে। কোনও দরকার লাগলে বোলো।

তোরা তো লোকের জন্য কতই করিস। অলকদা আজ দুপুরে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মোবাইলে অদ্ভুত মেসেজটা এল রাত আটটা নাগাদ। ইংরেজি হরফে বাংলায় লেখা, 'আমার জ্বর হয়েছে। টি'। আমি মেসেজটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। মোবাইল নম্বরটাও সম্পূর্ণ অচেনা। কার জ্বর হয়েছে এবং সেই খবরটা আমাকেই জানানোর কী দরকার, তা অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝতে পারা গেল না। সাধারণত অচেনা নম্বর থেকে মিসড কল বা মেসেজ এলে আমি কখনও সেই নম্বরে কলব্যাক করি না বা মেসেজ পাঠাই না। যার দরকার সে নিজের তাগিদেই আবার ফোন করবে। জনে জনে ফোন করার মতো পয়সা আমার বেশি হয়নি। তা বলে মেসেজটা মুছেও ফেললাম না। আছে থাক।

বাড়িতে ফিরে টার্ম পরীক্ষার জন্য পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ নারকোলের পুর জ্বাল দেওয়ার গন্ধ পেয়ে উঠে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখি মা আর বড়মা বসে নাড়ু পাকাতে পাকাতে গল্প করছে। মা বলছিল, দেখো না কাণ্ড, পরশুদিনই জন্মদিন ছিল মেয়েটার। দিব্যি হাসিখুশি, ডগমগ দেখাচ্ছিল, এই শুনছি কাল রাত থেকে

নাকি ধুম জ্বর। একশো চার জ্বর উঠেছিল। কী কাণ্ড বলো তো! কালই একবার দেখতে যেতে হবে।

বড়মা বলল, বর্ষাকাল তো, এ সময়ে জ্বরজারি হয়েই থাকে। চিন্তা করিস না। তা ছাড়া তানিয়ার মামাই তো কত বড় ডাক্তার।

আমি চুপ করে ঘরে ফিরে এসে মেসেজটা আর একবার দেখলাম। এও কি সম্ভব? তানিয়ার তো, যতদূর জানি, মোবাইল ফোন নেই। ওর মায়ের আবার এসব বিষয়ে কড়া শাসন। আর যদি মোবাইল হয়েও থাকে, তা হলেও কি তানিয়ার এত সাহস হবে আমাকে মেসেজ করার? করে লাভই বা কী? এমন নয় যে আমি গিয়ে ওর মাথা টিপে দেব কি মাথায় জল ঢালব কি কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে খাইয়ে দেব। তা হলে মেসেজটা কেন? আমি তো প্রেমিক নই। যদি বিয়েটা আদৌ কখনও হয়, তবে সেই সুবাদে সম্ভাব্য হবু স্বামী মাত্র। স্বামী হওয়ার পর না হয় ওসব আদর-আহ্লাদের প্রশ্ন ওঠে।

কিছুতেই বিশ্বাস হল না যে, মেসেজটা তানিয়াই পাঠিয়েছে। কারণ তানিয়ার সঙ্গে আজ অবধি কখনও আমার একটিও বাক্য-বিনিময় হয়নি। আর তানিয়া এখনও একজন আর্লি-টিনএজার। মনে হয় কেউ আমার সঙ্গে একটা ইয়ারকি করেছে। টি তো কত লোকেরই নামের আদ্যক্ষর হতে পারে।

কিন্তু ভুল ভাঙল রাতে, যখন খেয়েদেয়ে শুতে যাচ্ছি। রাত দশটা নাগাদ অপ্রত্যাশিত মধুপর্ণার ফোন।

কী করছিস রে?

এই তো, শুতে যাচ্ছিলাম।

এত তাড়াতাড়ি?

আমরা আর্লি-রাইজার তা জানিস না?

তা হলে থাক, ফোন রাখছি।

আরে দাঁড়া, দাঁড়া। হঠাৎ ফোন করলি কেন সেটা না জেনেশুনে কি ঘুম আসবে নাকি? ব্যাপার কী বল তো!

মেসেজটার জবাব দিয়েছিস?

কোন মেসেজের জবাব দেব?

কেন, তানিয়ার মেসেজটার!

তার মানে!

তুই কী রে? মেয়েটা জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে, আর তুই তার মেসেজটার জবাবই দিসনি? কত আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে মেয়েটা!

আমার কান গরম হয়ে উঠল। একটু দম ধরে রেখে বললাম, হ্যাঁরে মধু, তুই কি বাচ্চা মেয়েটার মাথায় এসব রোম্যান্স ঢোকাচ্ছিস! প্লিজ ওটাকে আর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাস না।

তুই আনরোম্যান্টিক বলে কি তানিয়াও তাই হবে?

প্রথম কথা, তানিয়ার কোনও মোবাইল ফোন নেই।

কে বলল নেই? ছিল না, কিন্তু হয়েছে। ওর জন্মদিনে ওর বড় মামা ওকে একখানা সুন্দর ছোট্ট মোবাইল উপহার দিয়েছে।

একটা ইনোসেন্ট মেয়েকে নষ্ট করার জন্য যা যা করা যায় তাই করা হচ্ছে বোধহয়।

ইনোসেন্ট কোন সেন্সে বলছিস? আজকাল আঠারো বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে হয় না ঠিকই, কিন্তু সে তো অন্ধ

আইনের নিয়ম। তা বলে চোদ্দো বছরের মেয়ের যৌবন তো দরজার বাইরে বসে থাকবে না।

যৌবন! মাই গড!

তুই তানিয়ার ভাবী বর, জ্যাঠামশাই নোস, এটা ভুলে যাস কেন?

তুই একটা হোপলেস।

আর তুই সেকেলে, প্রাচীনপন্থী এবং মানসিক জরাগ্রস্ত। সত্যি করে বল তো, তুই এত আনরোম্যান্টিক বা বলা ভাল অ্যান্টিরোম্যান্টিক কেন?

মধুপর্ণার কথাগুলো যে খুব মিথ্যে তা তো নয়। তাই একটু ভেবে মাথা ঠান্ডা করে বললাম, কী করব ভাই, ওটা জেনেটিক।

কীসের জেনেটিক? বুঝিয়ে বল!

আমাদের ফ্যামিলিটার কথা তো তোকে বলেছি।

কী বলেছিস? তোর তিন দাদু ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, জেল খেটেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেছেন। এমনকী তোর এক দাদু যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন তখন তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছিল পুলিশ এবং তোর জ্যাঠামশাই তখন তাঁর কোলে। তিনি ছেলে নিয়ে জেল খাটতে যান। তোরা স্পার্টান লাইফস্টাইলে বিশ্বাসী, মেয়েদের সম্মান করিস, এইসব তো!

নিজেকে একটু বোকা-বোকা লাগছিল। একটু হেসে বললাম, আর বলতে হবে না। ঘাট হয়েছে। এখন সত্যি করে বল তো, তানিয়াকে বুদ্ধিটা দিয়েছে কে?

তানিয়ার কি বুদ্ধি নেই?

বুদ্ধি হয়তো আছে, সাহস নেই।

বাহ্, বেশ কথা! মেয়েটাকে টেররাইজ করে রাখতে চাস বুঝি?

যাঃ! তা নয়। কিন্তু কী করব তা হলে?

মেসেজটার একটা জবাব দিলেই তো হয়।

মধু, একটা কথা বলবি? তুই নিজেই তো একটা আনরোম্যান্টিক বুড়ি! কোনও ছেলেকে পাত্তা দিলি না! তা হলে তোর এত রোম্যান্স এল কোত্থেকে?

মধুপর্ণা হাসল। তারপর বলল, আমার নৌকো ডুবে গেছে।

ফোনটা টুক করে কেটে দিল।

আর অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করে শয্যাকণ্টকী হওয়ার দশা। অবশেষে রাত সোওয়া একটায় উঠে তানিয়ার মোবাইলে একটা বোকা-বোকা মেসেজ পাঠালাম, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। বি।

গোলোকবিহারী

শাবলটা প্রায় আড়াই হাত লম্বা। ছ্যাঁচা লোহার তৈরি ভারী জিনিস। আগাটা চেঁছে চ্যাপটা আর ধারালো করা। আগে খুঁটি পোঁতার গর্ত করতে ব্যবহার হত। জিনিসটা আপনি দেখেননি। বড় সাংঘাতিক জিনিস। কিন্তু শাবলটা কতটা মারাত্মক সেটা আগে বুঝতে পারা যায়নি।

বলতে বলতে আমার কিন্তু বিভ্রম ঘটতে লাগল। এরকম হয়। টানা কিছু মনে করে বলতে পারি না। যেন জট পাকানো সুতো, ঠিক সূত্রটার খেই হারিয়ে ফেলি। তবে এই একজন মানুষ, যিনি আমার চোখের দিকে চোখ রেখে মন দিয়ে আমার কথা শোনেন। এই একমাত্র লোক। আর কেউ কখনও আমার কথায় মনোযোগ দেয় না। শোনেই না ভাল করে। কারণ তারা আমাকেই গুরুত্ব দেয় না। গুরুত্ব নেই বলেই বোধহয় আমি বড় হালকা-পলকা হয়ে গেলাম। যেন ভেসে আছি, স্থিতু নেই।

অলকবাবু খেই ধরিয়ে দিলেন, আপনি একটা শাবলের কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা শাবল। আড়াই হাত লম্বা, ভারী জিনিস। সেটা আগে শাবলই ছিল, নিতান্তই শাবল। কিন্তু আমার ছেলে ছোনে যখন সেইটে দিয়ে সৃষ্টিধরকে খুন করে ফেলল, তখন আর সেটাকে ঠিক আমার শাবল বলে মনে হত না।

সৃষ্টিধর কে বলুন তো!

আমি তার কাছ থেকে দু'কাঠা জমি কিনেছিলাম। অনেক কষ্টে, ধারে-কর্জে তলিয়ে গিয়ে। কিছু টাকা বাকি ছিল। তাই রেজিস্ট্রি হয়নি। সৃষ্টিধর তখন আর একজনকে জমিটা বেচে দেবে বলে বায়না নেয়। আমরা সবে একটু খোলার ঘর তুলেছি ওই জমিতে। সৃষ্টিধরের লোক এসে ঘর ভেঙে দিয়েছিল। তখন ওই শাবলটা...

থাক, আর বলার দরকার নেই।

না না, একটু শুনুন। এসব শোনারও দরকার আছে। নইলে ঠিক ট্রান্সফর্মেশনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না কিনা। আমার

ছেলে তখন গুন্ডা বা বদমাশ ছিল না। একটু চুপচাপ থাকত, একটু গম্ভীর। দুপুরে সেদিন পেটে ভাত পড়েনি কারও, বাইরে চোত মাসের রোদ্দুর। ঘর ভাঙা পড়ায় আমরা নিরাশ্রয় বসে আছি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে। ছোনে কখন শাবলটা হাতে নিয়ে উঠে গেছে টের পাইনি। পরদিন খালের ধারে সৃষ্টিধরের ডেডবডি পাওয়া যায়।

পুলিশ ছোনেকে ধরেনি?

না। বুঝে উঠতে পারেনি। সৃষ্টিধরের তো শত্রুর অভাব ছিল না। আর ছোনের বয়স তখন মাত্র পনেরো।

ট্রান্সফর্মেশনের ব্যাপারটা কী যেন বলছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলতে চাইছিলাম। ওই ঘটনার পর থেকে ছোনে যেমন বদলে গেল, তেমনি শাবলটাও বদলে গেল। শাবলটা আর শাবল রইল না, মারাত্মক এক অস্ত্র হয়ে গেল।

আবার চোখের সামনে কীসব যেন ভাসতে শুরু করল। যেন গাঢ় কুয়াশার ভিতরে নানা ভুতুড়ে অবয়ব। ঠিক বুঝতে পারি না কী। নানা আকার প্রকারের সব অচেনা জিনিস। আর কানে নানা শব্দও আসে। বারবার কথা ভুলে যাই। সুতো ছিঁড়ে যায়। কিন্তু অলকবাবু বড় ভাল লোক, কত ধৈর্য নিয়ে আমার কথা শোনেন। কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরে ওঠে, চোখে জল আসতে চায়।

আপনি একটা শাবলের কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা শাবলেরই গল্প। ওই শাবলটা দিয়ে সেই জমিতেই তিনটে গোখরো সাপ মারা হয়েছিল। তিন-তিনটে পাকা গোখরো। শেষ অবধি ওই জমিতেই আমরা ঘর তুলি।

দখলে ছিল বলে সৃষ্টিধরের ছেলে জমিটা আমাদেরই বেচে দিতে বাধ্য হয়। শাবলটা আমাদের জন্য অনেক করেছে, কী বলেন? তবু শাবলটাকে আমি ভয় পেতাম। চোখে পড়লেই গায়ে কাঁটা দিত।

অলকবাবু এখনও শুনছেন। মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন। বিরক্ত হচ্ছেন না তো! ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। উনি একজন বিজ্ঞ, বিদ্বান, বিলেতফেরত মানুষ। সেই জন্যই অন্যরকম।

শাবলটা নিয়ে কি আর কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, শাবলটা নিয়েই গোলমালটা হল। নইলে আমার স্ত্রী এভাবে খুন হয়ে যেতেন না।

খুন!

আপাতদৃষ্টিতে নয়, কিন্তু একমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন, এটা একটা খুনেরই ঘটনা।

উনি অতি নিয়ন্ত্রিত মানুষ। খুন শুনেও উত্তেজিত হলেন না। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, খুন হয়েছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে কেন?

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি হয়। আমাকে নিয়েই হয়। আমার স্ত্রীর রাগটা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কোনও কন্ট্রোল থাকে না। একবার আমার বুড়ি মাকে ধাক্কা দিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে ফেলে দিয়েছিলেন। আমার মায়ের পাঁজর এবং বাঁ হাত ভেঙে যায়। পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। শুয়ে শুয়ে শাপ-শাপান্ত করতেন। তা আমার স্ত্রী শুভময়ীকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। বড় অভাবের সংসার। এসব সংসারে অশান্তিও অনিবার্য। কী যেন বলছিলাম?

আপনার স্ত্রীর রাগের কথা।

হ্যাঁ, খুব রাগ ছিল ওঁর। খুব রাগ। আর সেটা ছিল আমার ওপর। পরশু অভাবজনিত কারণেই উনি আমার ওপর ভয়ংকর রেগে ওঠেন। আমার বড় মেয়ে মালবিকাও মায়ের পক্ষে। দু'জনে মিলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব আপনাদের সংসারে হয় না। তাই হয়তো আপনার মুখে একটু বিরাগ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সংসারে এসব নৈমিত্তিক ঘটনা।

হ্যাঁ, খানিকটা জানি।

তা পরশুদিন ব্যাপারটা একটু মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। আমার মনে আছে তাদের আক্রমণে আমি মেঝেতে পড়ে যাই। অসহায় অবস্থা। আমার স্ত্রী হঠাৎ আমার বুকে পা তুলে দাঁড়ালেন। আর আমি দেখলাম, তাঁর দু'হাতে সেই কালান্তক শাবল।

সেই শাবলটা?

হ্যাঁ। সৃষ্টিধর এবং তিনটে গোখরোর ঘাতক। শুভময়ীর তখন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। ঠোঁটের কোণে ফেনা, চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে, নাকের পাটা ফুলছে। উনি শাবলটা তুলে আমার বুকে বসানোর জন্য একটা কোঁত দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আমার মেয়ে অবশ্য চিৎকার করে মাকে বারণ করছিল, মেরে ফেলো না, মেরে ফেলো না। আমি শুভময়ীর দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম উনি কী করতে যাচ্ছেন সেই হুঁশ ওঁর নেই। আমি তাই তীব্র রাগে শুধু মনে মনে বলেছিলাম, স্টুপিড উওম্যান, ডেথ টু ইউ।

অলকবাবু স্তব্ধ। শুধু দু'টি নিবিড় চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ।

আপনি অলৌকিক বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেই একই ঘটনা ঘটে গেল। আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হলেন। ঠিক শাবলরামের মতোই।

অলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিছু বললেন না।

আমার হিসেবমতো এবং আমার বিচারে আমি দুটো খুন করেছি। শাবলরাম আর শুভময়ী। অলকবাবু, আমার মনে হচ্ছে, আমার হাতে আরও কেউ কেউ খুন হয়ে যেতে পারে।

ওঁর বাঁ দিকে যে-কমপিউটারটি রয়েছে তাতে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী ঝলমল করছে। সমুদ্রের মধ্যে একটা সবুজ পাহাড়। পিছনে নীল আকাশ। একটি সাদা পালতোলা নৌকো। ভারী সুন্দর একটি দৃশ্য। এরকম দৃশ্য আমি বাস্তবে কখনও দেখিনি। বোধহয় বিদেশের বা আন্দামানের ছবি। আমি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যাইনি। ছেলেবেলা থেকে প্রায় একই পটভূমিতে বড় হতে হতে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া গেল। পাহাড়, সমুদ্র না দেখলেও আমাদের চলে যায়। কোনও অসুবিধে হয় না। আমাদের অসুবিধেগুলো এত ছোটখাটো যে অনেকে শুনে বিশ্বাসই করতে পারে না। সুস্নাতবাবুর স্ত্রী চিত্রলেখা সেদিন বলছিলেন, আপনি কখনও সমুদ্র দেখেননি এটা হতেই পারে না।

অলকবাবু বোধহয় আমাকে কিছু বলছিলেন, আমার চোখের সামনে আবার সেই কুয়াশা। হঠাৎ এমন কতগুলো দৃশ্য দেখছিলাম যে বাহ্যচৈতন্য একরকম ছিল না বললেই হয়।

তাড়াতাড়ি ঘোরটা থেকে ভেসে উঠে বললাম, কিছু বললেন আমাকে?

হ্যাঁ, এসব কথা কাউকে বলবেন না। লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে।

আমি বললাম, বলব না। কিন্তু আমার কি মনস্তাপ হওয়া উচিত নয়?

আপনার ধারণা ভুল। শুধু ইচ্ছে বা অভিশাপ দিয়ে কাউকে খুন করা বাস্তবভাবে সম্ভব নয়। কল্পনায় হয়। শাবলরাম বা আপনার স্ত্রী স্বাভাবিক কারণেই মারা গেছেন, আপনার তাতে কোনও হাত নেই। ঘটনা দুটোই আকস্মিক। হয়তো তারও লজিক্যাল ব্যাখ্যা আছে। হার্টের রুগিদের উত্তেজক মুহূর্তে হার্টঅ্যাটাক হওয়া কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দু'জনেই মারা গেছেন খুব উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে। আপনি দু'দিন বিশ্রাম নিন, দরকার হলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন।

উনি হয়তো ঠিক জানেন না যে, দীনদরিদ্র অকিঞ্চনদের প্রতি ঈশ্বরের ওই একটি দয়া আছে, তাদের অনিদ্রারোগ নেই। রোগ-শোক-অশান্তি-উদ্বেগ সত্ত্বেও নেই। পেটজোড়া খিদে নিয়েও তারা বেশ ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আমার ঘুম হয়, খুব ঘুম হয় আমার। এত ঘুম যে মাঝে মাঝে ভয় হয় যে, বুঝি মরেই গেছি।

আমার স্ত্রীর হার্টের রোগ ছিল কি না তা আমি অবশ্য জানি না। থাকতেই পারে। কিন্তু কখনও পরীক্ষা করা হয়নি। আমাদের শরীরে নানা আধিব্যাধি থাকলেও তার খবর আর কেই বা রাখতে বসেছে!

উনি বললেন, এই দু'টি ঘটনার জন্য আপনি নিজেকে অপরাধী ভেবে অকারণে কষ্ট পাবেন না। আপনি অপরাধী নন।

কথাটা শুনে আমি আবার চিন্তায় পড়ে গেলাম। যদি খুন দুটো আমিই করে থাকি তা হলে নিজেকে আমার অপরাধী বলে ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যে বাস্তব ও পরাবাস্তবের মাঝামাঝি একটা কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে বাস করি সেখানে স্বাভাবিক যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে কিছুই ঘটে না। শাবলরামের মৃত্যুর পর প্রথমটায় কৃতকর্মের জন্য আমি খানিকটা অপরাধবোধ করেছিলাম বটে, কিন্তু কয়েকদিন পর আমার মনে হতে লাগল যে, এই যে আমি একজনকে বললাম 'তুমি মরো' আর তৎক্ষণাৎ সে মরে গেল, এটা তো বড় কম কথা নয়! দুপুরের দিকে আমি মাঝে মাঝে টিফিনে বেরিয়ে ওই নতুন পার্কটায় গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে থাকি। সেইখানে বসে বসে একদিন দুপুরে ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে নিজের ভিতরে একটা অলৌকিক শক্তির জাগরণে আমি খুব উত্তেজনাবোধ করতে থাকি। এও কি এক ধরনের সাকসেস নয়? এ কি বড় কম কথা! তারপর শুভময়ী যখন শাবলটা উদ্যত করে ধরেও আমার চোখে চোখ রেখেই ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মতোই আমার ওপরে আছড়ে পড়ল এবং শাবলটা ভয়ংকর ঝন ঝন শব্দ করে ছিটকে গেল ইটের মেঝেয় তখন আমি আমার দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেলাম। জয়? হ্যাঁ, একরকম জয়ই তো বলা যায় একে! নাকি! না, এখন আমার তেমন অপরাধবোধ বা অনুশোচনা হচ্ছে না তো! বরং যেন একটু একটু মনের

জোর পাচ্ছি। নিজেকে তত এলেবেলে, নিষ্কর্মা আর অপদার্থ মনে হচ্ছে না।

অলকবাবু, আমি একটু জল খাব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলে উনি একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল এগিয়ে দিলেন।

আমি অনেকটা জল খেয়ে একটা বড় শ্বাস ফেললাম। একটা ঢেকুর উঠল। বুকটা এখন একটু ঠান্ডা। বললাম, আমি আজ উঠি।

সাবধানে যাবেন।

আপনি আমাদের যে-অর্থসাহায্য পাঠিয়েছেন তাতে আমাদের বড় উপকার হয়েছে। আপনার বড় দয়া।

কী যে বলছেন! দয়া কিসের?

টাকার কথা বলছি না, যার আছে সে তো দিতেই পারে। আপনি যখন আমার অসংলগ্ন কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন, অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তখন আপনার দয়া আমি টের পাই। কত কথাই তো বলার আছে আমার। কেউ তো শোনে না। একমাত্র আপনি।

বেরিয়ে এলাম।

কে যেন আমার সাইকেলটা খুব যত্ন করে সারিয়ে দিয়েছে। মানুষের নিষ্ঠুরতা সীমাহীন বটে, আবার তার দয়ারও যেন শেষ নেই। কিন্তু মুশকিল হল, আমার পুরনো সাইকেলটা এত জোরে চলত না। চাকায় টাল ছিল, তেল-টেল দেওয়া হত না, বলবিয়ারিং ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল, চেন খুলে পড়ে যেত, সিট নড়বড়ে ছিল। মেরামতির পর এখন সেই সাইকেল প্যাডেলে

চাপ দিতে না দিতেই স্পিড তুলে দেয়। যেন আমাকে দেখাতে চায় যে, সে আর পুরনো মানুষটি নেই, বদলে গেছে। এই বদলে-যাওয়া সাইকেলের সঙ্গে আমার ঠিক বনিবনা হচ্ছে না।

চিলড্রেন্স পার্কের কাছে নেমে পড়লাম। পার্ক এখন জনশূন্য, বাতিস্তম্ভের সামান্য আলো আর গাছের ছায়ায় আন্দোলিত অন্ধকারে বড় মায়াময়। প্রায়ই আমি এই পার্কে এসে বসে থাকি। আজও বসলাম।

ভুবনবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি যে একা একা কথা বলেন, কার সঙ্গে বলেন? কাউকে কি কাছেপিঠে দেখতে পান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, আজ্ঞে মনে হয় পাই।

ভূত-প্রেত গোছের কিছু কি?

অনেকটা যেন ওইরকমই কিছু।

আহা, বেশ খুলেই বলুন না। ভূত-প্রেত সম্পর্কে আমার একটু ইন্টারেস্ট আছে।

কাকে যে বলি তা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে কেন যেন মনে হয় কেউ বোধহয় শোনে।

কে শোনে?

ভগবানও হতে পারে।

ভগবান? বলেন কী!

ওই তো বললাম, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

আপনার ভয় করে না?

করে। তবে ভয়-ভীতি আমাদের নিত্য সঙ্গী।

কথাটা হল, পচা নর্দমা থেকে যেমন অবিরল ভুরভুরি ওঠে আমার ভিতর থেকেও তেমন কথার ভুরভুরি আপনা থেকেই উঠতে থাকে। এইসব কথা আমার চেনা কথা নয়। কোথা থেকে এদের সৃষ্টি হয় তাও জানি না। কিন্তু কথার পর কথা আমার অজান্তেই বেরিয়ে আসে।

এই যে এখন পার্কটার একটা বাতিস্তম্ভের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় আমি বেঞ্চে বসে আছি, আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমার বাঁ দিকে আর একটা গাছের তলায় কেউ একজন গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘাসের ওপর এলিয়ে বসে আছে। রোজই থাকে। আমি ইচ্ছে করেই ওদিকটায় ভাল করে তাকাই না। এমন তো হতেই পারে যে, আসলে ওখানে কেউ বসে নেই। ওটা নিতান্তই আলো আর ছায়ায় তৈরি একটা বিভ্রম মাত্র। পাছে বিভ্রমটা ধরা পড়ে যায় সেই ভয়েই আমি ওদিকে তাকাই না। যে বসে আছে থাকুক। ভুলই যদি হয় সেই ভুলটা ভাঙবার দরকার কী আমার! বিভ্রম দিয়েই যদি আমাদের কাজ চলে যায় তা হলে তাকে ঘুচিয়ে দেওয়ার মানে হয় না। কুয়াশায় ভরা মাথা নিয়ে আমি বসে আছি। মুখ দিয়ে অচেনা সকল কথা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় কার কাছে পৌঁছোচ্ছে কে জানে।

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সেদিন আমি এরকমই এক মোহময় কুয়াশা মেখে বসে ছিলাম। গায়ে খুব ব্যথা ছিল—মাথায়, হাঁটুতে, গালে, কনুইয়ে। খুব শীত করছিল ভেজা গায়ে। আমাকে মৃত্যুর আগে শুভময়ী খুব মেরেছিল। মালবিকাও। সেসব অপমান আর লাঞ্ছনা ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টির জলে। দু'টি অল্পবয়সি

ছেলে-মেয়ে এসে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। তাদের আমার মনে নেই।

রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের বারান্দায় একজন ভিআইপি বসে আছে। দেখে ভারী তটস্থ হয়ে পড়লাম। সাইকেলখানা রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে একটু দূরত্ব রেখেই বসলাম। দূরত্ব বরাবরই ছিল, এখন সেটা প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভিআইপি-র কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গও উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার কমজোরি আলোতেও ওই কয়েকজনের চেহারা যা দেখা যাচ্ছিল তাতে লোকের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে যাওয়ার কথা। এই ভিআইপি-টিকে নিজের ছেলে বলে ভাবাটা বোধহয় আমার পক্ষে একটা স্পর্ধার সামিল। আমি তা ভাবিও না। আর ছোনেও অতিশয় যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমাকে বহুকাল বাবা বলে ডাকেনি। বোধহয় বাবা বলে ভাবেও না। তা না ভাবুক, ছোনের জন্য আমার বা আমাদের একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার আছে। ঠিক বটে যে, ছোনে সুভাষ বোস বা ক্ষুদিরাম হয়নি, হয়েছে ছোনেগুন্ডা। তা আমাদের মতো লোকের ঘরে সেটাই বা কম কী? কিছু একটা হওয়ার জন্য, পাঁচজনের চোখে একটু হিরো বনবার জন্য লোকে তো কম কিছু করছে না রে বাপু!

ভাইয়ের পাশাপাশি বসে মালবিকা হাপুস হয়ে কাঁদছিল। বোধহয় মায়ের জন্যই। ছোনের পরনে ধড়া-টড়া নেই, পাতলুন আর লাল টি-শার্ট। এরকমই তো হওয়ার কথা। ধড়া গায়ে তো অ্যাকশন-ট্যাকশন করা যায় না! পাতলুনের পিছনের পকেটে হাত দিয়ে ছোনে একগোছা নোট বের করে মালবিকার হাতে

দিয়ে বলল, এটা রাখ। মায়ের কাজটা ভাল করে করিস।

মালবিকা কান্না সামলে বলল, কত আছে?

দশ হাজার।

শুনে আমার বুকটা যেন কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। দশ হাজার! দশ হাজার! দশ হাজার তো সোজা টাকা নয়!

ছোনে উঠে দাঁড়াল। তার সময় মূল্যবান। বলল, চলি রে দিদি।

মালবিকা বলল, মায়ের কাজের দিন আসবি না?

আরে না! অনেক ঝামেলা আছে।

বটেই তো! বটেই তো! ভিআইপি-দের কত কাজ থাকে। চলে যাওয়ার সময় ছোনে একবার আমার দিকে তাকালও। আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তবে আমি যেখানে রয়েছি সেই রান্নাঘরের দাওয়ায় কোনও আলো নেই। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। ছোনে বোধহয় আমাকে ভাল করে দেখতেও পেল না। তা না পাক! একবার যে তাকিয়েছে তাই তো যথেষ্ট। এর বেশি আর আমি কীই বা প্রত্যাশা করতে পারি?

ছোনে আর তার দলবল নিঃশব্দে চটপটে পায়ে চলে গেল। আমি আমার সাইকেলখানা টেনে হিঁচড়ে ঘরে তুলে ফেললাম। বেশ উত্তেজনাবোধ করছি। ছোনে এসেছিল—এটা যে আমাদের পক্ষে একটা মস্ত ঘটনা!

'খিদে পেয়েছে' কথাটা এ বাড়িতে একরকম নিষিদ্ধ। 'খিদে পেয়েছে' বললেই শুভময়ী ভীষণ রেগে যেত। তাই আমি গত পনেরো বছর কথাটা উচ্চারণ করিনি। আজও করলাম না। বরং আমি বেশ খানিকটা জল খেয়ে ফেললাম। জলে খানিকটা

হলেও কাজ হয়। মালবিকার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দেখতে ভাল নয়। পেটে তেমন বিদ্যে নেই। ছলাকলাও জানে না। তার বিয়ে হবে কি না তা বলা মুশকিল। কাউকে এখনও জোটাতে পারেনি বলেই বোধহয় সবসময়ে একটা রাগী মুখ করে থাকে। মেয়েকেও আমি যথেষ্ট সমীহ করি এবং দূরত্ব বজায় রাখি।

শুভময়ীর শ্রাদ্ধে মোট পাঁচজন সন্দেহজনক ব্রাহ্মণ জোগাড় হল। একজন রিকশা চালায়, একজন হাসপাতালের সাফাইকর্মী, একজন ফেরিওয়ালা, একজন স্কুলপড়ুয়া, একজন কলোনির সমাজকর্মী। এর সঙ্গে ছয়জন শ্মশানবন্ধু আর পুরুতমশাই। মোট বারোজনকে চিঁড়ে-দই, বোঁদে আর রসগোল্লা খাওয়ানো হল। পুরুতের দক্ষিণা বিস্তর দর কষাকষির পর পঞ্চাশে রফা হয়েছিল। আমার হিসেবমতো গোটা শ্রাদ্ধ হাজার-বারোশোর মধ্যেই বেঁধে রাখা গিয়েছিল। এই টাকাটা গিরিজাবাবুর প্রায় হাতে পায়ে ধরে আমাকেই জোগাড় করতে হয়। কারণ ছোনের দেওয়া দশ হাজার টাকার কথা একবার অতি নিম্নকণ্ঠে তুলেছিলাম বলে মালবিকা এমন তেড়ে এসেছিল যে আমাকে একরকম পালিয়ে বাঁচতে হয়। তা টাকাটা বরং ওরই থাক। ওরও তো বোধহয় একটা ভবিষ্যৎ আছে।

গিরিজাবাবু আমাকে কোনও মাথার কাজ দেন না। বেশির ভাগটাই ফাই-ফরমাশের কাজ। মক্কেলদের কাছ থেকে ইনকাম ট্যাক্সের কাগজপত্র আনা, নানা ডকুমেন্টের ফোটোকপি করানো, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার জোগাড় করা, পোস্টঅফিস বা কুরিয়ারে চিঠিপত্র পাঠানো, কাস্টমারদের কাছ থেকে চেক নিয়ে এসে ব্যাঙ্কে জমা করা, ইনকাম ট্যাক্স

অফিসে গিয়ে নানা কাজে ধর্না দেওয়া। ফলে আমার সময় কিছু খারাপ কাটে না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। চেনা মানুষদের বাড়ি গিয়ে দু'দণ্ড বসেও থাকতে পারি। থাকিও। কেউ পছন্দ না করলে উঠে চলে আসি। কেউ কেউ অপছন্দ করলেও তাড়ায় না। আবার কেউ হয়তো গেলে একটু খুশিও হয়।

যেমন চিত্রলেখা। গেলেই লোহার ফটক খুলে দিয়ে ভিতরে নিয়ে বসান। চা এবং সঙ্গে বিস্কুটও দেন।

আজ গিয়ে দেখি, চিত্রলেখা বাইরে রাস্তার ধারের কদম গাছটার নীচে থেকে কদম ফুল কুড়োচ্ছেন। ভারী খুশি হয়ে বলি, ফুল কুড়োচ্ছেন?

চিত্রলেখা লজ্জা পেয়ে বালিকার মতো হাসলেন। বললেন, কী করি বলুন তো! রোজ এত কদমফুল ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে থাকে যে, লোভ সামলাতে পারলুম না। স্পন্ডেলাইটিস আছে বলে নিচু হওয়া ডাক্তারের বারণ, তবু না কুড়িয়ে কি পারি?

আমি বরং কুড়িয়ে দিচ্ছি।

আর দরকার নেই। অনেক কুড়িয়েছি। কোঁচড় ভরে গেছে। এই দেখুন না।

দেখলাম, ওর কোঁচড় ভরা কদমফুল। তা ফুল-টুল বোধহয় খারাপ জিনিস নয়। পুজোয় লাগে, বিয়েতে লাগে, শ্রাদ্ধে লাগে, জন্মদিনে লাগে, মৃত্যুদিনে লাগে, ঘর সাজাতে লাগে।

এবার অনেকদিন পরে এলেন।

যে আজ্ঞে।

আপনার স্ত্রীর কাজ ভালভাবে মিটে গেল তো?

আজ্ঞে।

এই বয়সে বউ মরলে পুরুষমানুষের বড় কষ্ট। এখন যদি আমি মরে যাই সুস্নাতর কী হবে বলুন তো! ওর যে ডান-বাঁ জ্ঞানটাও নেই!

কথাগুলোর মধ্যে ভালবাসার রস যেন মৌচাকের মধুর মতো টস টস করছে। কান জুড়িয়ে যায়।

আসুন, ঘরে আসুন।

সাইকেল লক করে, বারান্দায় আমার নোংরা চটিজোড়া ছেড়ে সন্তর্পণে ওদের বসার ঘরে ঢুকি। ভারী চমৎকার সাজানো পরিপাটি ঘর। একটা চিনেমাটির প্লেটে উনি কদমফুল সাজিয়ে সেন্টার টেবিলে রেখে দিলেন। বললেন, বসুন। ক'দিন ধরেই আপনার কথা মনে হচ্ছিল।

আমি ভারী অবাক ও আপ্লুত হয়ে বলি, আমার কথা!

হ্যাঁ। মধুপর্ণাকে চেনেন?

মধুপর্ণা! ছবি আঁকে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের পাড়ার সমীর চক্রবর্তীর মেয়ে।

এইটুকু বেলা থেকে চিনি। কত কোলেপিঠে করেছি।

ও-মা! তাই? তা মধুপর্ণা বলল, যেদিন আপনার স্ত্রী মারা যায় সেদিন নাকি শোকে পাগলের মতো হয়ে আপনি ঝড়বৃষ্টিতে চিলড্রেন্স পার্কে গিয়ে বসে ছিলেন। ও আর ওর এক বন্ধু গিয়ে আপনাকে ধরে এনে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল আমার। এরকম ভালবাসার কথা শুনলে চোখে জল আসে। সেদিন আমি ভাবছিলাম আমি মরে গেলে কি সুস্নাতও ওরকম করবে? আমার কি অত ভাগ্য?

শুনে বড় বিব্রতবোধ করতে থাকি। ঘটনাটা সত্য হলেও ব্যাখ্যাটা ভুল। স্বাভাবিক নিয়মে পত্নীবিয়োগে শোকাতুর হওয়ারই তো কথা। এবং বেশি বয়সে বউ মরলে পুরুষের যে বড়ই কষ্ট, এ কথাও ঠিক। কিন্তু মুশকিল হল, সংসারের এই স্বাভাবিক নিয়মগুলি সর্বত্র ক্রিয়াশীল বা বলবৎ নেই। যেরকমটা হওয়ার কথা আমার ঠিক সেরকমটা হচ্ছে না। শুভময়ীর সঙ্গে আমার দাম্পত্যজীবন যেন এক দীর্ঘ দ্বৈরথ। প্রথম কয়েকটা দিনের আদর আহ্লাদের পরই যেন সংসারে সাপ ঢুকে পড়ল। আমাদের ভাষা ও ব্যবহার ক্রমে ইতর থেকে ইতরতর হতে লাগল। লড়াই আর শেষ হয় না। সন্ধিপ্রস্তাব নেই। অস্ত্র সংবরণের প্রশ্ন ওঠে না। আহত, রক্তাক্ত হতমান দুই মহারথী বার বার পরস্পরকে দাঁতে-নখে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। যে-কোনও একজনের মৃত্যু না ঘটলে লড়াই শেষ হওয়ার ছিল না। কিন্তু উনি তো এসব জানেন না! এও জানেন না যে, শোকে নয়, শুভময়ীর মৃত্যুর পর আমি এক ভীষণ ত্রাসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তার পরের গোটা ঘটনাই আবছা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিত্রলেখা বললেন, বড় কষ্ট পেয়েছেন আপনি, না?

আমি ভালমানুষের মতো বললাম, হ্যাঁ, বড় কষ্ট।

চা এল, সঙ্গে জিরে দেওয়া নোনতা বিস্কুট। অতি সুস্বাদু।

চিত্রলেখা একটু আনমনা হয়ে জানলার বাইরে কদমগাছটার দিকেই বোধহয় চেয়ে ছিলেন। চোখ ছলছল করছে। আঁচল তুলে চোখ মুছে বললেন, আমাদের আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা দু'টি প্রাণী বড় একা। কেউ কি কাউকে ছাড়া

বাঁচব?

এও বড় ভালবাসার কথা। এসব কথা আমার নিত্যকার চেনা জগতের কথা নয়। আমি সন্তর্পণে বললাম, আপনার একটি ছেলে আছে বলে শুনেছিলাম যেন!

আছে তো। ছেলে তার মতো করে আছে। ছেলেরা বড় হয়ে তো আর কাছে থাকে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই অদ্ভুত। একবার বিয়ে হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত আর দু'জনের ছাড়াছাড়ি নেই। ঠিক এইরকম সম্পর্ক জীবনে আর কারও সঙ্গে হয় না। মা-বাবা না, ভাই-বোন না, ছেলে-মেয়ে না। ঠিক কি না বলুন? ডিভোর্স বা অকালমৃত্যু হল অস্বাভাবিক ব্যাপার। সেটা না ধরলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো এমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আর নেই।

যে আজ্ঞে।

আগে আমি ঠাকুর দেবতা মানতাম না। আজকাল খুব মানি। কেন মানি জানেন? সুস্নাতর জন্য। মা কালীকে বলি, আমি যতদিন বাঁচব ততদিন সুস্নাতও যেন বেঁচে থাকে।

আমি বললাম, সুস্নাতবাবুর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। তাঁকে নিতান্তই ছেলেছোকরা বলে মনে হয়। আপনি তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন?

সেটাই তো বুঝতে পারি না। আমার টেনশনের কোনও কারণ নেই জানি, তবু বুকটা কেমন দুরদুর করে ওঠে যখনই ভাবি যে দু'জনের একজনকে একদিন একা হয়ে যেতে হবে।

সুস্নাতবাবুর সঙ্গে আমার প্রায়ই নানা জায়গায় দেখা হয়। অতি সুপুরুষ, ইদানীং একালের ছেলেছোকরাদের মতো অল্প

অল্প দাড়ি রাখছেন, মাথায় অবিন্যস্ত চুলেরও কিছু আকর্ষণ থাকতে পারে। চিন্তাশীল মানুষ। তবে মহিলাদের লক্ষ করতে পছন্দ করেন। কথাটা অবশ্য চিত্রলেখাকে বলা উচিত হবে না।

চিত্রলেখা একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলব গোলোকবাবু?

আমি তটস্থ হয়ে বলি, আজ্ঞে বলুন।

সুস্নাতর একটা দোষ আছে। মহিলাঘটিত।

আমি একটু বিপন্নবোধ করে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

উনি বললেন, এ নিয়ে আমার অনেক অশান্তি গেছে। মাঝখানে কিছুদিন ভালই ছিল। ভেবেছিলাম, বয়স হয়েছে, এখন হয়তো ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তো ওর স্ত্রী। আর কেউ টের না পেলেও আমি ঠিকই টের পাই যে, ও আবার কারও পাল্লায় পড়েছে। কেমন অস্থির, উড়ুউড়ু ভাব, আমার চোখে চোখ পড়লেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। সিমটমগুলো আমি ভাল চিনি। আপনাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবেন?

যে আজ্ঞে। বলুন।

আপনার তো এ শহরের সকলের সঙ্গে চেনা। সারাদিন আপনি সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুস্নাত কার সঙ্গে মিশছে সেই খবরটা কি আপনি আমাকে দিতে পারবেন? এটা কলকাতা নয়, মফস্‌সল, সুতরাং খবরটা জোগাড় করা শক্ত হবে না।

আমি বললাম, যে আজ্ঞে।

মনে হল, কদম গাছটার প্রতি ওঁর একটা আকর্ষণ আছে।

জানালা দিয়ে কদমগাছটার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। আর টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। অতি করুণ দৃশ্য। একটু ফোঁপানির শব্দও হল। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললেন, আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু আমি তো সুন্দর নই! সেই জন্যই বোধহয় সুস্নাত বারবার অন্য সব মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ত। আমার প্রতি ওর আকর্ষণ নেই জানি, কিন্তু আমি তো ওকে ছাড়া বাঁচতেই পারব না।

মুশকিল হয় আমি গুছিয়ে কথা কইতে পারি না। আমার মাথার খামতির দরুন চিন্তাটিন্তাগুলোও উলটোপালটা আসে। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে বেরিয়ে যায়। তবে সুস্নাতবাবুর দুর্বলতার কথা আমি জানি। মেয়েটিকেও চিনি। কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়ান। বন্দনা সিংহ। গিরিজাবাবুর মক্কেল। শ্যামলা রোগা চেহারা, মাথায় অনেক চুল। স্বামী অভিজিৎ সিংহ দিল্লিতে মস্ত চাকরি করেন। কয়েকদিন হল, রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে গোড়ালিতে চোট হয়েছে। কলেজে যাচ্ছেন না।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, অনেকটা দূর হবে।

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বললেন, কী দূর গোলোকবাবু? কীসের কথা বলছেন?

ডক্টর বন্দনা সিংহের বাড়ি।

বন্দনা সিংহ! সে কে বলুন তো!

নয়াপাড়া। শহরের বাইরে। খুব গাছগাছালি আছে। নরেন ভাওয়ালের বাগানবাড়ি ছিল তো! এখন ভেঙেটেঙে একটা হাউজিংমতো হচ্ছে। ওখানে জমির অনেক দাম। বড়লোকের পাড়া।

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

আমার কথায় যে বিস্তর ফাঁকফোকর আছে তা আমি বুঝতে পারছি। চিত্রলেখাকে সমস্ত বিষয়টা বোঝানো আমার পক্ষে শক্ত হবে। আমি তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথার কুয়াশাটা কাটানোর চেষ্টা করলাম।

তারপর বললাম, মেয়েটি ডক্টর বন্দনা সিংহ। ফিলজফির প্রফেসর।

চিত্রলেখার তবু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চোখ বড় বড় করে বললেন, তার মানে, আপনি কী বলতে চাইছেন যে, সুস্নাত বন্দনা সিংহ নামে কোনও মেয়ের সঙ্গে ইনভলভড?

আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

ঠিক জানেন তো? নাকি আন্দাজ?

এবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক জানি না। তবে তিনি সেখানে যান, প্রায়ই যান। এইটুকু জানি।

কী সর্বনাশ! জেনেও বলেননি তো!

কত কিছু হয় চারদিকে! কত কিছু হয়।

কিন্তু ওরা কতটা ঘনিষ্ঠ সেটা যে জানা দরকার গোলোকবাবু। এমন তো হতে পারে ওরা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে।

যে আজ্ঞে। হয়তো তাই।

প্লিজ, আপনি ভাল করে জেনে এসে খবরটা আমাকে দিন। আমি ভীষণ টেনশনে থাকব।

যে আজ্ঞে।

এটা আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন, মনে রাখবেন।

যে আজ্ঞে।

টেবিলের ওপর প্লেটে কদমফুলের স্তূপটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটু। কিছুদিন পর কদমফুল আর ফুটবে না। চিত্রলেখা কদমফুল বড় ভালবাসেন।

লোকে নয়াপাড়া বললেও জায়গাটার এখন একটা কেতাদুরস্ত নাম দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রলোক হাইভস। চারদিকে উঁচু বাহারি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা বাগান। নরেন ভাওয়াল রাজ্যের দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি এনে লাগিয়েছিল। তারই মধ্যে ফাঁকেফোঁকরে দোতলা-তিনতলা সব ভারী চমৎকার বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া আবার খানিকটা করে নিজস্ব বাগান। সব বাড়িতে এখনও লোক আসেনি। সদর ফটকে কড়া সিকিউরিটি আছে। অতি সুব্যবস্থা। ভিতরে কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা।

দারোয়ানরা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আমি সাইকেলখানা চালিয়ে বন্দনা সিংহের নিরিবিলি নিঃশব্দ বাড়িটার সামনে এসে নামি। সাইকেলখানা লক করে সন্তর্পণে বারান্দায় উঠে যাই। ডোরবেলের খুব সংক্ষিপ্ত একটা টুং আওয়াজ হয় মাত্র। দরজা খুলে বন্দনা সিংহের ঝি মিনতি আমাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে, দিদিমণির শরীর তো খারাপ। ঘুমোচ্ছেন।

একটু বসতে দেবে?

বিরক্ত হলেও মিনতি জানে, আমি বড় অপদার্থ লোক। তাই দরজা খুলে দিয়ে বলে, বসে থাকতে পারেন কিছুক্ষণ। কিন্তু দেখা হওয়ার চান্স নেই।

সব বাড়িতে গিয়েই সময় বা অসময়ে আমি মাঝেমাঝে ধর্না

দিই কিছুক্ষণ। বেশিরভাগ মানুষই কিছু মনে করে না। গুরুত্বও দেয় না।

মিনতি ভিতরদিকে কোথাও চলে গেল। আমি সুস্নাতবাবুর গতিবিধি লক্ষ রেখেই এসেছি। নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে একটা গ্রিলের গেট। সেটা টানা, তবে তালা দেওয়া নেই। সুতরাং দোতলায় উঠে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হল না। বড় একটা সাজানো ল্যান্ডিং। তারপর চমৎকার একখানা হলঘরের মতো বড় ঘর। সেটা পার হলেই বন্দনার শোওয়ার ঘর। স্প্রিং-দেওয়া দরজা। ভিতর দিকে মোটা কাপড়ের পরদা। ভিতরে এসি মেশিন চলছে তা বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।

আমি দরজা ঠেলে ঢুকলাম। কোনও শব্দ হল না। ভারী পরদার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের জানালাগুলোর পরদা খুব ভালভাবে টানা। ঘরে ডানধারে বিশাল একখানা খাট। আবছা মিহি অন্ধকার।

আমি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে অপরূপ মিথুন-দৃশ্যটি দেখতে পেলাম। পৃথিবীর আদিমতম দৃশ্য! দু'টি সম্পূর্ণ নিরাবরণ নর ও নারী পরস্পরের সঙ্গে কী গভীর আশ্লেষে লিপ্ত রয়েছে। তাদের ধুন্ধুমার শ্বাস ও আহ্লাদজনিত শব্দাবলিতে ঘরটি যেন শিহরিত হচ্ছে।

কোনও লজ্জা বা সংকোচ হল না। আমি দিব্যি ঘরে ঢুকে জানলার সামনে রাখা একটি চেয়ারে নিঃশব্দে বসে পড়লাম। এরকম দৃশ্য এত সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করা ভাগ্যের ব্যাপার।

ঘরটি ভারী ঠান্ডা। বাতাসে সুগন্ধ ছড়ানো। আবহ অতি

চমৎকার। মিথুনবদ্ধ নরনারী দু'টিও অতি সুন্দর।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। নারী ও পুরুষ দু'জনেই ধীরে ধীরে স্থির হলেন। বিচ্ছিন্ন হতে একটু সময় নিলেন। তারপরই আচমকা বন্দনা আর্তনাদ করে উঠলেন, কে? কে ওখানে?

আমি তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, আজ্ঞে আমি। আমি গোলোকবিহারী।

দু'জনে স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপরই সুস্নাতবাবু হঠাৎ লাফ মেরে নেমে এলেন খাট থেকে।

বাস্টার্ড! রাসকেল! কোন সাহসে এখানে ঢুকেছিস?

আত্মরক্ষার্থে আমি তাড়াতাড়ি দু'টি হাত তুলে মুখ আড়াল করে বললাম, আজ্ঞে আমাকে চিত্রলেখা পাঠিয়েছেন।

সুস্নাতবাবুর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। বাধাপ্রাপ্ত কামই ক্রোধ, এবং ক্রোধই হিংসার বন্ধু। পরপর দু'টি ঘুসি খেয়ে আমার চোখ অন্ধকার হয়ে এল। উনি দু'হাতে আমার গলা টিপে ধরে বললেন, আই শ্যাল কিল ইউ। কিল ইউ বাস্টার্ড!

আমার গলায় কাশি আসছিল। কিন্তু কাশতে পারা যাচ্ছিল না। দম বন্ধ হয়ে গেল। চোখ যেন ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথায় রিমঝিম। মৃত্যুর শীতল স্পর্শ আমার পায়ের দিক থেকে শরীরে উঠে আসছে, টের পাচ্ছি। সুস্নাতবাবুর মুখের দিকে আবছা চোখে চেয়ে তীব্র ঘৃণায় বললাম, ড্রপ ডেড!

আচমকা আমার গলা থেকে হাতের ফাঁসটা আলগা হয়ে গেল। বড় বড় পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকেই

ধীরে ধীরে সুস্নাতবাবু ঢলে পড়ছিলেন। একখানা অসহায় হাতে নিজের বুকটা খামচে ধরার চেষ্টা করতে করতে তিনি কার্পেটের ওপর পড়ে গেলেন। হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তিনি। চেষ্টা বোধহয় ফলবতী হল না। ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা মুখ দিয়ে জিভটা বেরিয়ে এলিয়ে রইল। সম্পূর্ণ নগ্ন সুস্নাতর দেহ আমার পায়ের কাছটিতে পড়ে আছে।

আমার চেতনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে আমার। ভীষণ কাশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সম্ভবত পেচ্ছাপে ভিজে গেছে প্যান্ট। কাশির দমকে চোখ ভরে আছে জলে। তার মধ্যেই দেখলাম, বন্দনা তাড়াতাড়ি একটা নাইটি পরে নেমে এসে সুস্নাতর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আর্তনাদ করছেন, সুস্নাত! সুস্নাত! কী হল তোমার? ওরকম করছ কেন?

পরমুহূর্তেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, কী করেছেন আপনি সুস্নাতকে? মেরেছেন?

কথা বলার মতো অবস্থা আমার নয়। শুধু ডাইনে বাঁয়ে সজোরে মাথা নেড়ে জানালাম, আমি মারিনি।

বন্দনা হাউমাউ করে উঠলেন, সর্বনাশ! সুস্নাত যে শ্বাস ফেলছে না! ওর যে হার্টবিট নেই! সুস্নাত কি মারা গেছে?

সুস্নাত মারা না গেলে যে আমাকে মরতে হত তা আমি আমার শরীরের অবস্থা দেখে টের পাচ্ছি। প্রোটিন নেই, ভিটামিন নেই, রক্তের জোর নেই, পুষ্টি নেই। আমার শরীরখানা শুধু বেঁচে আছে। বড় ক্ষণজীবী মানুষ আমরা। বড্ড পলকা,

ভঙ্গুর। আর কয়েক সেকেন্ড সুস্নাতবাবু আমার গলাটা চেপে রাখলেই হয়ে যেত।

বন্দনা আর্তস্বরে বললেন, এখন কী হবে? এই ডেডবডি নিয়ে এখন আমি কী করব? সারা শহরে যে ঢি ঢি পড়ে যাবে! আমি এখন কী করি!

বলতে বলতে বন্দনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

কাশতে কাশতে আমি উপুড় হয়ে পড়ছিলাম। শরীরে একরত্তি শক্তি নেই। তবু অনেক কষ্টে আমি উঠে দাঁড়াতে পারলাম। আমার তৃতীয় ভিকটিমের মৃতদেহটি ডিঙিয়ে আমি ভারী দরজাটা খুলে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। শোওয়ার ঘরটি এয়ার-কন্ডিশনড। কাচের দরজা জানালা। ওই ঘর থেকে বাইরে কোনও শব্দ আসে না। আরও কিছুক্ষণ ঘটনাটা কেউ জানতে পারবে না।

আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। আমার বশংবদ সাইকেলখানা আস্তে আস্তে আমাকে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে লাগল।

খুবই বিস্ময়ের কথা, তিন-তিনটে খুনের পরও পুলিশ এল না। আমাকে গ্রেফতার করা হল না। বিচার হল না। ফাঁসিও হল না। শহরে শুধু ডক্টর বন্দনা সিংহ আর সুস্নাতবাবুকে নিয়ে একটি মুখরোচক রটনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মাথায় বিস্ময় ও কুয়াশা নিয়ে আমি শুধু ভাবতে থাকি, আমি শয়তান, না ভগবান!

একাকিনী, শোকাকুলা চিত্রলেখার কাছে আমি মাঝে মাঝে যাই।

চিত্রলেখা বলেন, দেখুন গোলোকবাবু, এখন আর গাছটায় কদমফুল ফুটছে না।

আমি বলি, হ্যাঁ। কদমফুলের মরশুম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কী? আর ক'দিন পরেই আপনার বাগানের শিউলি গাছে ঝেঁপে ফুল আসবে। শিউলিফুল অতি চমৎকার ফুল। কোঁচড় ভরে কুড়োতে পারবেন।

দেখুন, সুস্নাতর জন্য একটা সোয়েটার বুনছিলাম। প্যাটার্নটা সুন্দর না? অর্ধেকটা তো হয়েও গিয়েছিল। এখন আর সোয়েটারটা শেষ করার অর্থ হয় না, না?

বুনতে থাকুন। তিনি মারা গেছেন বটে, কিন্তু আপনার ভালবাসা তো মরেনি। সোয়েটারের বুনোটে সেটা ফুটে থাকবে।

চিত্রলেখা বলেন, একা হয়ে যাওয়াটাকে বড্ড ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু দেখুন সেই একাই তো হয়ে যেতে হল! এত বড় বাড়িটা যেন সারাদিন আমাকে গিলতে আসে।

একা! আমি বড় ভাবনায় পড়ে যাই। তারপর বলি, কী জানেন, ঠিকঠাক একা হওয়া ভারী মুশকিল। আমি সবসময়ে টের পাই, আমার আশেপাশে কারা যেন আছে। হয়তো বাতাস, হয়তো আলো ছায়া, হয়তো মনের ভুল বা চোখের বিভ্রম। তবু আছে কিন্তু। সারাদিন আমি একা একা যত কথা কই তারা সব শোনে।

তারা কারা?

তা জানি না। কিন্তু শোনে। দেয়ালের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, চড়াই পাখির বা কাকের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, মনের ভার কমে যাবে।

চিত্রলেখা হাসেন, দূর! লোকে পাগল ভাববে।

তা ভাবুক না। আমার চারদিকের জগৎ তো আমাকেই রচনা করে নিতে হবে!

একদিন শুনি চিত্রলেখা ওঁর ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন, কে বিল্টু? হ্যাঁ বাবা, আমরা ভাল আছি।... বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাও? কিন্তু সুস্নাত তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।... হ্যাঁ বাবা, সুস্নাত এখন খুব ঘুমোয়, ভীষণ ঘুমোয়। ডাক্তার বলেছে যত ঘুমোবে ততই ওর ভাল।... ক্ষমা চাইবে? কেন বাবা, ক্ষমা চাইতে হবে কেন তোমাকে? তুমি ক্ষমা চাওয়ার অনেক আগেই সুস্নাত তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।... না, তুমি মন খারাপ কোরো না। আমরা কিছু মনে রাখিনি।.. এই তো সারাদিন গাছপালা দেখি, উল বুনি, টিভি দেখি। সময় বেশ কেটে যায়। আমরা কিছু খারাপ তো নেই।... হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকদিন তোমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি ঠিকই। ভাবি, তোমরা ওখানে যা ব্যস্ত থাকো, ফোন করলে হয়তো অসুবিধে হবে। আর ও দেশের সঙ্গে আমাদের সময়ের এত তফাত যে হিসেব করে ফোন করতে হয়। সেটাই গুলিয়ে ফেলি যে।... কখন উঠবে? তার তো ঠিক নেই। এক সময় নিশ্চয়ই উঠবে, তখন তোমার কথা বলব। তুমি ফোন করেছিলে জানতে পারলে খুব খুশি হবে। কিন্তু ওর এখন খুব ঘুম দরকার। ডাকতে বড় মায়া হয় যে...

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বুকে ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

তানিয়া

আমার অবস্থা এখন ডাকঘরের অমলের মতো। জানালা দিয়ে যাকেই দেখছি তাকেই ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। একা একা বিছানায় পড়ে থাকতে যে কী বিচ্ছিরিই লাগছে আমার! কিন্তু জ্বরটা যখন ভীষণ বেড়ে গিয়ে একশো পাঁচ-একশো ছ'য়ে পৌঁছে যায় তখন সমস্ত শরীরে কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব আর মাথার মধ্যে ঘোর। জ্বর যখন বাড়ে তখন নাকি আমি ভুলভাল কথাও বলে ফেলি। প্যারাসিটামল খেয়ে আর মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে জ্বর কমানো হয়। কয়েক ঘণ্টা বেশ থাকি। তারপর আবার শোঁ শোঁ করে জ্বর এসে যায়। জ্বালাতন!

ডাক্তারকাকু হাম্বির রায় টাইফয়েড বলে সন্দেহ করেছিলেন। কাল বিকেলে রক্তের রিপোর্ট এসেছে। টাইফয়েডই। শুনে এত মন খারাপ হয়ে গেল! এখন কতদিনের জন্য ঘরবন্দি কে জানে! আর আমার অসুখবিসুখ হলেই দেখেছি বাড়ির লোকের কাজ বেড়ে যায়। ডাকলে পরে মা এসে একটু বসেই এটা করে আসি, ওটা দেখে আসি বলে উঠে যায়। আর আমার ভাই বুধুয়া তো আমাকে পাত্তাই দেয় না, ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র সন্ধের পর বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে আমার কাছটিতে বসে গল্প করে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হয়তো পাড়ার ক্লাব থেকে পুজোর মিটিং-এ ডেকে নিয়ে গেল বা কেউ দেখা করতে এল।

টাইফয়েড শুনে আমার চোখে জল এসেছিল। ডাক্তারকাকু কাল রাতে এসে রিপোর্ট দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ভাল রোগ

বাঁধিয়েছিস। এমনিতে টাইফয়েড আজকাল কোনও সিরিয়াস অসুখ নয়। কিন্তু তোর হিমোগ্লোবিন বেশ কম। আটের নীচে। তোকে ক্লোরোমাইসিটিন তো দেওয়া যাবে না, রিস্ক আছে। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু ভাল করে খেতে হবে যে!

আমি খুব ভয় পেয়ে বলি, আমার যে খুব পেট খারাপ। খেতে একদম ইচ্ছে করে না।

পেট খারাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। ওটা এই রোগে হয়। কিন্তু খেতে ইচ্ছে না করলে তো হবে না। জোর করে খাবি। ডায়েটিং-ফায়েটিং করিস নাকি? এইচ-বি কাউন্ট এত কম কেন?

লজ্জায় মুখ ঢেকে বললাম, একটু একটু করি। কিন্তু এখন ভীষণ অরুচি।

ডাক্তারকাকু কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন, তা বললে হবে না। সব খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, শাকসবজি, ফল, দুধ, ঘি, মাখন।

আমি দুষ্টুমি করে বললাম, ফুচকা?

তাও খেতে পারিস, তবে ঘরে তৈরি করা চাই। বাইরের খাবার নয়।

এমা! তা হলে আর মজা কীসের?

এক-একবারে ক'টা করে খাস?

দশ-বারোটা।

পেটের বারোটা বেজে যাবে কিন্তু।

কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে খাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি। আমার এতটুকু তো পেট, তার ওপর অরুচি, ওয়াক আসে, ফলে অসুখটার ওপর ভারী রাগ হয়। পুরু মাখন লাগানো

কড়কড়ে টোস্ট আমার ভীষণ প্রিয়। আজ সকালে সেদ্ধ ডিম আর টোস্ট খেতে গিয়ে মুখ বিস্বাদে ভরে গেল। টাইফয়েডের পর নাকি লোকে মোটা হয়ে যায়। তার ওপর এত খেলে আমি একটা ধুমসি হয়ে যাব না তো!

অসুখের মধ্যে আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার হল মামার দেওয়া মোবাইল ফোনটা। মা অবশ্য হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আলমারিতে চাবি বন্ধ করে রেখেছিল। বলেছিল, যখন কলেজে যাবে তখন মোবাইল পাবে। এখন নয়।

মনটা খুব খারাপ ছিল সেই থেকে। স্কুলে আমার কত বন্ধুরই তো মোবাইল আছে। কিন্তু মায়ের সব বিষয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি।

তবে অসুখ হওয়ার পর ঘ্যানঘ্যান করায় দয়া করে বের করে দিয়েছে। মোবাইলের ব্যবহার আমি একটু একটু জানি। সব জানি না। কিন্তু হাতে নিয়ে নানা বোতাম টিপে খেলা করতেও তো ভাল লাগে! বন্ধুদের একটু-আধটু ফোন করি। অসুখের খবর পেয়ে তারা দলবেঁধে একদিন দেখে গেছে। কিন্তু রোজ তো আর সঙ্গ দিতে আসা সম্ভব নয়। অসুখ হলে এটাই সবচেয়ে বিচ্ছিরি, বড্ড একা হয়ে যেতে হয়।

দুপুরে জ্বর এল। মাথা ধুয়ে প্যারাসিটামল খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে মনটা আনন্দে ভরে গেল। আমার বিছানার পাশে মধুদি বসে আছে। মধুদির মুখটাই এমন যে, দেখলে মন ভাল হয়ে যায়। কারও কারও বোধহয় এরকম অদ্ভুত মুখ থাকে। যদি সুন্দর বলি, তা হলে কিছুই বলা হয় না। আমার বন্ধুদের মধ্যে যেমন পর্ণা। দেখতে একেবারে হিরোইন।

কিন্তু সবসময়ে মুখটা এমন আঁশটে করে রাখে যে দেখলেই রাগ হয়। মধুদির সৌন্দর্যটা যেন ভীষণ গম্ভীর আর খুব স্নিগ্ধ।

খুশি হয়ে বললাম, বাব্বাঃ, তিন দিন পর তোমার সময় হল?

বাঃ রে, আমি কী করে জানব যে তোর জ্বর হয়েছে?

কতক্ষণ এসেছ?

আধঘণ্টা তো হবেই। তুই ঘুমোচ্ছিলি, আমি বসে বসে তোর ঘুমন্ত মুখের একটা স্কেচ আঁকলাম।

ওমা, দেখি দেখি!

দেখে চোখ স্থির হয়ে গেল আমার। একটা বালিশ, তাতে ছড়ানো রয়েছে এলোমেলো চুল, বুক পর্যন্ত একটা চাদর, আর পাশ ফেরানো আমার মুখখানা। এত সুন্দর হয়েছে যে বলার নয়।

ইস, কী ভাল এঁকেছ গো! এটা আমি বাঁধিয়ে রাখব। দাঁড়াও, মাকে ডেকে দেখাই।

মা-ও দেখে বলল, সত্যি মধুপর্ণা, তোমার আঁকার হাত এত ভাল যে, বিশ্বাস হয় না। হ্যাঁরে তানিয়া, মধুর কাছে একটু আঁকাজোঁকা শিখতে পারিস না? দ্যাখ তো, মেয়েটার কত গুণ। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে...

উঃ মা, তুমি পারোও বটে। এ শহরের সবাই ও গল্প জানে। আর এও জানে যে মধুপর্ণা চক্রবর্তীর অনেক গুণ। সবাই কি আর মধুপর্ণা হতে পারে?

আহা, মেয়ের মেজাজ দেখো না! জ্বর হয়ে আরও খিটখিটে হয়েছে।

মধুদি হাসছিল। মা চলে যাওয়ার পর বলল, খুব বোর হচ্ছিস তো?

ভীষণ।

জ্বরটর হলে ওই জন্যই খারাপ লাগে। ফোনটোন করিস?

একট-আধটু।

বাবলুকে?

ধ্যাৎ! তুমি যেন কী! ওকে ফোন করতে যাব কেন?

সে কী রে! বাবলুকেই তো সবার আগে খবরটা দিবি।

যাঃ! বাবলুদার সঙ্গে কখনও কথাই বলিনি আমি।

ভয় পাস নাকি?

ভয় কেন পাব? কিন্তু কোনওদিন তো আর কথা-টথা হয়নি।

তোর কথা বলতে ইচ্ছে করে না?

ধ্যাৎ!

সত্যি কথা বল তো?

ভীষণ লজ্জা পাই যে ওকে।

লজ্জা তো হতেই পারে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় কি না বল?

মুখ লুকিয়ে হাসছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আজকাল আমার ওরকম ইচ্ছে একটু-আধটু হয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে এসেছি, ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। যখন বয়স কম ছিল, বিয়ের মানেই ভাল করে বুঝতাম না, তখন খুব একটা কিছু হত না। কিন্তু আজকাল হয়। এমনকী মাঝে মাঝে দেখতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু মুখোমুখি পড়ে গেলে লজ্জায় মরি। এক-একদিন হঠাৎ ধূমকেতুর মতো সাইকেলে সাঁ করে দূর দিয়ে চলে যায়। ওই একটুই যা দেখা। খুব পুরুষ মানুষের মতো জোরালো চেহারা। দেখলেই কেন যেন বেশ লাগে।

মৃদু স্বরে বললাম, একটু একটু হয়। কিন্তু কী করব বলো? উপায় তো নেই। আমাদের চারদিকে কত গার্জিয়ান দেখছ তো!

দূর বোকা। এই তো তোর হাতের মুঠোতেই উপায় রয়েছে। একটা মেসেজ করে দেখ না। কথা বলতে হয়তো নার্ভাস লাগবে। কিন্তু মেসেজ করতে তো দোষ নেই। আর বাবলু তো আমার ভীষণ বন্ধু। জানিস তো?

তা আর জানি না!

ওর মতো ভাল মনের ছেলে আমি আর দেখিনি। শুধু একটাই দোষ। বড্ড নীতিবাগীশ। লাহিড়ি-বাড়ির সব ছেলেরাই বোধহয় তাই।

হ্যাঁ। ওরা একটু কনজারভেটিভ। আর সেই জন্যই তো বড্ড ভয় করে।

নিয়মটা একটু ভেঙেই দেখ না, কী হয়।

যাঃ, হয়তো রাগ করবে।

না রে, বাবলুকে আমি ভীষণ ভাল চিনি। রাগ করবে না। বরং খুশি হবে। কোনও মেয়ে যদি কোনও ছেলেকে গুরুত্ব দেয় বা শেল্টার চায়, তা হলে ছেলেরা খুশিই হয়।

মেসেজে কী লিখব বলো তো?

শুধু লেখ যে তোর জ্বর হয়েছে। তার বেশি কিচ্ছু নয়।

আমি মেসেজ করতে জানি না যে!

আয় শিখিয়ে দিচ্ছি।

ও মা! তুমি শেখাবে কী? তোমার তো মোবাইলই নেই! তুমি তো মোবাইল-বিরোধী!

তা ঠিক। আমার লাগে না, কিন্তু তোর এখন দরকার। এত একা থাকবি কী করে!

ও রাগ করবে না তো?

আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তোমার কথাই বিশ্বাস হয়। ঠিক আছে, শিখিয়ে দাও।

মধুদি বলে দিল, আর আমি মেসেজটা লিখে 'সেন্ড' বোতামটা টিপে দিলাম। বুকটা টিপটিপ করছিল। নির্লজ্জ ভাববে না তো!

মধুদি হাসছিল, বাব্বাঃ, হবু বরকে একটা মেসেজ করতেও এত টেনশন! আর আজকাল তোর বয়সি মেয়েরা কীরকম হুল্লোড়বাজি করছে দেখে আয় তো! প্রত্যেকের একটা-দুটো করে বয়ফ্রেন্ড।

মেসেজটা করে কিন্তু আমার ভালই লাগছিল। বাবলুদা এখনও আমার বড় অচেনা রয়ে গেছে। একটু তো যোগাযোগ হল! যদি মেসেজের জবাব দেয় তা হলে বোধহয় আনন্দে মরেই যাব। দেখো ঠাকুর, যেন রাগ-টাগ না করে। আমার বয়স কম বলে যেন নাক না সিঁটকোয়।

অনেকক্ষণ ছিল মধুদি। কী যে সুন্দর সময়টা কেটে গেল! মনে হচ্ছিল আর বোধহয় আমার শরীরে অসুখ নেই। কথাটা মধুদিকে বলেও ফেললাম। আমার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, কাল বা পরশু আবার আসব।

না মধুদি, পরশু নয়। কাল আসবে। আর রোজ আসবে।

রোজ এলে কি আর ভাল লাগবে রে?

তুমি এসে দেখো, আমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

মধুদি চলে যাওয়ার পর জ্বর আবার বাড়ল। বাড়ারই কথা। ডাক্তারবাবু মাকে বলেছেন, ঘনঘন প্যারাসিটামল খাওয়াবেন না। তাতে জ্বরের ওঠানামাটা বোঝা যাবে না। জ্বরের একটা চার্ট রাখতে হবে।

ফলে প্যারাসিটামল কমিয়ে দেওয়া হল। জ্বরের ঘোরে আমি বারবার অন্য একটা জগতে চলে যাচ্ছিলাম। সেটা ট্যাঁশগরু আর হুঁকোমুখো হ্যাংলার দেশ।

সকালে জ্বরটা অনেক কম। সারারাত ভাজাভাজা হওয়ার পর সকালবেলাটায় বাইরের মেঘভাঙা রোদ দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল। একটা বুলবুলি পাখি জানালার বাইরে পেয়ারার ডালে বসে আছে দেখে আরও ভাল লাগল। কিন্তু আনন্দে বুকটা উথালপাথাল হল যখন মোবাইলটা খুলে মেসেজটা দেখলাম—'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। বি।' অবিশ্বাস্য! সত্যিই বাবলুদা তো! হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কে হবে! স্ক্রিনে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে বললাম, তুমি খুব ভাল। একটুও রাগ করোনি। বকোনি তো আমাকে! আজকের দিনটা যে কী সুন্দর! অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে ঢেউ ঢেউ হতে লাগল। হাসি এল, চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আমার পুরুষমানুষটি একটু হলেও তো মায়া করেছে আমাকে! উপেক্ষা তো করেনি!

মা যখন কমলালেবুর রস গেলাচ্ছিল আমাকে তখন আমার মোবাইল হঠাৎ পাখির ডাক ডাকতে লাগল। কল।

ফোনটা তুলে বললাম, হ্যালো।

কী রে পাগলি, তোর নাকি খুব জ্বর?

হ্যাঁ, অলকদা। ভীষণ জ্বর। টাইফয়েড হয়েছে।

হ্যাঁ, হাম্বিরদার কাছে শুনেছি। তোকে দেখতে যাব। কী নিয়ে যাব বল তো তোর জন্য? ক্যাডবেরি?

তুমি আজকেই এসো, এক্ষুনি।

দূর! এখন কী করে যাব? দেখি সন্ধেবেলা যদি পারি। কী নিয়ে যাব বললি না?

কিচ্ছু না। শুধু তুমি এসো। আমার সঙ্গে কথা বলার লোক নেই। বড্ড একা লাগছে।

জানি তো। অসুখবিসুখ হলে তো একা লাগবেই। এখন বল তো কী নিয়ে যাব?

আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। জোর করে খাওয়ায়।

তোর নাকি হিমোগ্লোবিন কম। না খেলে তাড়াতাড়ি ভাল হবি কী করে?

এত খেলে ধুমসি মোটা হয়ে যাব তো!

অলকদা হাসল, একটু তো খেতেই হবে।

তা হলে আমার জন্য আচার এনো, আর চুরন।

ওসব এখন খেতে নেই। ক'দিন পরে খাস।

এসো কিন্তু। খুব অপেক্ষা করে থাকব।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

ফোনটা বন্ধ করতেই মা ধমক দিয়ে বলল, ও কী সহবত তোর! সম্পর্কে ভাশুর হয় না? তাকে তুমি-তুমি করে বলতে আছে?

আমি অবাক হয়ে বলি, সেই ছেলেবেলা থেকেই তো তুমি

করে বলে আসছি। এখন হঠাৎ আপনি-আজ্ঞে করলে যে অলকদাই বকুনি দেবে।

মা তবু গজগজ করতে থাকে, কী যে হয়েছে আজকালকার মেয়েরা! শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাশুর সবাইকে পাইকারি হারে তুমি-তুমি করা। ওতে মান্যিগণ্যির ভাবটা আসে না। ইয়ার-বন্ধু তো নয়।

সারাদিন জ্বর বাড়ল আর কমল। অনেকটা বাড়ল একটু কমল। কতবার ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। আবার ফিরে এলাম। দুপুরে মা ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে গা গরম জলে স্পঞ্জ করে দিল। পাউডার ছড়িয়ে দিল গায়ে। চুল আঁচড়ে দিল। আয়নায় নিজের মুখটা একটু দেখলাম। একটা টিপ পরলে বেশ হত। দরকার নেই বাবা!

দুপুরে একটা গল্পের বই পড়তে গিয়ে দেখলাম, চোখে জল চলে আসছে আর মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বই রেখে অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকতে হল। এইসব লম্বা লম্বা দুপুর আমার কীভাবে কাটবে কে জানে। ডাক্তারকাকু কবে যে আমার অসুখ সারিয়ে দেবেন! আমি কি মরে যাব? যদি যাই তা হলে কী হবে? সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বাবা। তারপর মা। কিন্তু তারপর? আর কেউ কাঁদবে কি? বাবলুদা! নিশ্চয়ই কাঁদবে। কাঁদবে না? নাও কাঁদতে পারে বাবা! এখন তো কো-এডুকেশনে পড়ে। আর কাউকে যদি পছন্দ হয়ে গিয়ে থাকে? এ মা, তা হলে তো আমি মরে গেলে বাবলুদা খুশিই হবে! হবে না?

কেমন অস্থির হয়ে উঠে বসে ফোনটা তুলে খুব ভেবেচিন্তে মেসেজটা লিখে ফেললাম—'আমি মরে গেলে কী হবে?'

মেসেজটা পাঠিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জবাবটা আসছে না তো! এত সময় লাগছে কেন?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মেসেজের টুং-টাং শব্দ হল। তুলে দেখি লেখা আছে—'গাঁট্টা খাবে।'

কী অসভ্য দেখেছ! ইস, কী বিচ্ছিরি করে লিখেছে! আমার চোখ ভরে জল এল আবার।

বিকেলে মধুদি এলে কাঁদোকাঁদো হয়ে বললাম, দেখেছ, ও কী মেসেজ পাঠিয়েছে! কী অসভ্য লোক বলো তো!

মধুদি খুব হাসল। বলল, তুই-ই বা মরার কথা লিখতে গেলি কেন? সেই জন্যই তো বকুনি দিয়েছে।

ওভাবে বকবে বুঝি?

ঠিকই তো করেছে। ন্যাকা মেয়েরাই ওসব মরা-টরার কথা বলে ইম্পর্ট্যান্স পেতে চায়। তোর তো তার দরকার নেই। বাবলু হল ভীষণ পুরুষালি মানুষ। আবেগ-উদ্বেগ কম। যেসব পুরুষ কেবল মেয়েদের মন রাখা কথা বলে, ও তাদের দলে নয়। আর তোর কি মরার মতো অসুখ কিছু হয়েছে? টাইফয়েড তো জলভাত। তার ওপর হাম্বির রায়ের মতো ডাক্তার তোকে দেখছে।

তাই বলে অসুস্থ একটা মেয়েকে বুঝি ওরকম কথা বলতে হয়?

আমার চোখ টস টস করছিল জলে। ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে।

ওমা, কাঁদছিস কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, বাবলুকে আমি বকে দেব।

না, তুমি কিচ্ছু বোলো না। আমি আর ওকে মেসেজ করব

না তো! আমার আরও জ্বর হোক। খুব জ্বর হোক, মরে গেলেই ভাল।

মধুদি কিছু বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আর আমি খুব কাঁদলাম খানিকক্ষণ। গাঁট্টাই তো মারবে! একটা ছোট্ট মেয়ে অসুখ হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে তো গাঁট্টাই মারবে। ভারী বীর! মাকে আমি আজই বলব, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না। নিশ্চয়ই ওর মেয়ে বন্ধু আছে। তাই আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। কে জানে কারও প্রেমে-ট্রেমে পড়েছে কি না! নিশ্চয়ই পড়েছে। হয়তো মধুদির সঙ্গেই প্রেম করছে। এত বন্ধু যখন।

কত কী আবোল-তাবোল যে মনে হল তার মাথামুন্ডু নেই। কিন্তু বুক ফুলে ফুলে উঠছিল অভিমানে।

আমি মধুদির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ওকে বিয়েই করব না।

মধুদি একটু হেসে বলল, করিস না।

করব নাই তো! কথায় কথায় যে গাঁট্টা মারতে চায়, সে ভীষণ খারাপ।

আয়, তোকে গল্পের বইটা পড়ে শোনাই। নিজে পড়তে পারছিস না তো! জ্বর হলে আমিও দেখেছি, বইটা পড়া যায় না। মাথা ধরে, চোখে জল আসে, পড়ব?

পড়ো। বলে আমি চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম। মধুদি কী সুন্দর রিডিং পড়ে। স্পষ্ট উচ্চারণ, যে জায়গাটা যেমন করে পড়া উচিত ঠিক সেই ভাবে, আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছিল। আমার মনটা একটু একটু করে ভাল হয়ে যাচ্ছে।

মনটা একদম ভাল হয়ে গেল যখন সন্ধের মুখে অলকদা

এসে হাজির হল। ঘরটার যেন আলো হল, বাতাস হল।

কেমন আছিস রে পাগলি?

আমার হাসি আর ধরে না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। অলকদা কপালে হাত রেখে বলল, এখন তো বেশ জ্বর আছে!

একশো দুই।

দুটো দু'রকম বিদেশি পারফিউম, চারটে বড় বড় চকোলেট বার আর এক সেট ঝলমলে সালোয়ার কামিজ নিয়ে এসেছে অলকদা।

ইস, এত এনেছ কেন? আমার কি আজ জন্মদিন?

না হলেই বা কী? অসুখ হলে মানুষ ভিআইপি হয়ে যায়। ফান্ডাই আলাদা!

ও অলকদা, মধুদিকে চেনো?

অলকদা যেন মধুদিকে হঠাৎ দেখতে পেল। চোখ দুটোয় ভারী অবাক ভাব। বলল, ওঃ, তুমি তো মধুপর্ণা, না? ভীষণ ভাল ছবি আঁকো, কবিতা লেখো?

মধুদিকে এই প্রথম দেখলাম ভয় পেতে। মধুদির মতো সাহসী মেয়ে যে কেউ নেই, একথা সবাই জানে। মধুদির পিছনে অনেক ছেলে লেগেছে, ভয় দেখিয়েছে, শাসিয়েছে, কিন্তু কাউকে কখনও ভয় পায়নি। পুরুষের চোখের দিকে চোখ রেখে তাকাতে মধুদির কোনও ভয় নেই। কিন্তু আজ ওর মুখ ফ্যাকাসে, চোখ মেঝেতে, ভীষণ নার্ভাস। হাত থেকে বইটা পর্যন্ত পড়ে গেল।

অলকদা একটা চেয়ার টেনে বসে মধুদিকে বলল, তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দেবে মধুপর্ণা? বাবলু বলে তুমি নাকি হুবহু মুখ আঁকতে পারো।

মধুদি চোখ তুলে তাকাতেই পারল না। তবে কাঁপা হাতে ওর চামড়ার ব্যাগ থেকে স্কেচবুকটা বের করল! তারপর অলকদার দিকে একবারও না তাকিয়ে স্কেচবুকে ঝুঁকে একমনে আঁকতে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিট।

আঁকাটা দেখে অলকদা এত অবাক হল যে, কিছুক্ষণ কথাই বলল না। তারপর একটা জোর শ্বাস ফেলে বলল, মধুপর্ণা, কী করে আঁকলে? তুমি তো আমার মুখের দিকে একবারও তাকাওনি! তা হলে কী করে হুবহু এঁকে ফেললে বলো তো! তুমি কি ম্যাজিক জানো?

মধুদি এই প্রথম একটু হাসল। মাথা নিচু রেখে ভারী লজ্জার হাসি। আর আমি, একটা চোদ্দো বছরের পুঁচকে মেয়েও বুঝতে পারছি, মধুদি হঠাৎ আজ সন্ধেবেলায় বদলে গেছে। সেই ডাকাবুকো, সাহসী, স্পষ্ট মেয়েটা যেন আজ একদম জড়োসড়ো, ভিতু, নার্ভাস। সেই চেনা মধুদিই যেন নয়!

মধুপর্ণা ছবিটা আমাকে দেবে? আমি এটা সুন্দর করে বাঁধিয়ে রাখব।

মধুদির লজ্জা এখনও যায়নি। মাথা নিচু করে মৃদু হেসে ক্ষীণ গলায় বলল, আপনার পছন্দ হয়েছে?

পছন্দ হয়েছে মানে? ফোটোগ্রাফকেও হার মানায়। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। মুখের দিকে না তাকিয়ে কী করে এরকম নিখুঁত আঁকা সম্ভব!

মধুদি শুধু মাথা নিচু করে হেসে যাচ্ছে, জবাব দিল না।

আমি আমার ছবিটা বের করে অলকদাকে দেখালাম, দেখো, মধুদি কালকেই আমার এই ছবিটা এঁকেছে।

অলকদা খুব ভাল করে দেখে বলল, দারুণ। এরকম ট্যালেন্ট আমি আর দেখিনি। তোমার কবিতাও আমি পড়েছি। ভীষ্ম নামে একটা কবিতা লিখেছিলে না তুমি?

মধুদি অল্প করে মাথা নাড়ল।

একটা লাইন আজও মনে আছে—'মোহময় মৃত্যুর কাছে নতজানু তুমি।'

মধুদি যেন লজ্জায় মরে গেল আজ। হাতটাত কাঁপছে। কী যে হচ্ছে এসব! চোদ্দো বছর বয়সে সব কিছু বুঝতে নেই, জানি। কিন্তু আমার যে আজ একটা অদ্ভুত কিছু মনে হচ্ছে! যা মনে হচ্ছে, তাই? প্লাস?

কিন্তু একটু অভিমানও হল আমার। অলকদা তো আমাকেই দেখতে এসেছে আজ! কিন্তু আমাকে ফেলে শুধু মধুদির সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। কত কথা! আমি বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজলাম। জ্বর বাড়ছে। ঘোর বাড়ছে। অনেকক্ষণ বাদে একবার চোখ চেয়ে দেখলাম, তখনও দু'জন কেবল কথা বলে যাচ্ছে। কথা আর ফুরোয় না ওদের।

তারপর যে কখন দু'জনেই চলে গেছে, তা আর আমি টেরই পাইনি! মা আমাকে খাওয়াতে এসে বলল, হ্যাঁ, ওরা অনেকক্ষণ ছিল। কফি করে খাইয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ। অলকদা কত জিনিস দিয়ে গেছে দেখেছ?

দেখেছি। দু'জনকে বেশ মানায় কিন্তু।

কাকে মানায় মা, কার সঙ্গে?

অলক আর মধুপর্ণা। ঠাকুর করলে কী না হয়!

আমি হাসলাম।

একদিন সকালবেলা নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে ডাক্তারকাকু এসে জ্বরের চার্ট দেখে বললেন, এই তো ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। আর দু'-একদিনের মধ্যেই রেমিশন হয়ে যাবে। ভাল করে খাচ্ছিস তো?

হুঁ। মা জোর করে খাওয়াচ্ছে।

জোর করেই খেতে হবে। নইলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে কী করে?

তার চেয়ে ভিটামিন খেয়ে নিলেই তো হয়।

দূর, ভিটামিন ক্যাপসুল খেয়ে কিছু হয় না। ভাল করে খা। তোর কাজ হল শুধু খেয়ে যাওয়া।

মধুপর্ণাদি বেশ কয়েকদিন পরে আসায় খুব রাগ হল, বললাম এই তোমার আসার সময় হল, রোজ পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে চোখ ব্যথা হয়ে গেল আমার!

মধুদি মুখ টিপে হেসে বলল, একটা পরীক্ষা ছিল রে। বাবলুর সঙ্গে ঝগড়া মিটল?

গোঁজ হয়ে বললাম, মিটবেও না। যা গাঁট্টা খেয়েছি। আর এসএমএস করব না বাবা! ভীষণ কাঠখোট্টা লোক। আচ্ছা, তুমি না ভীষণ সাহসী? পুরুষরা নাকি তোমাকে ভয় পায়, কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না?

ওসব কে তোকে বলেছে?

সবাই তো বলে। মধুপর্ণার দারুণ পার্সোনালিটি।

তাতে বুঝি তোর হিংসে হয়েছে?

মোটেই না। কিন্তু তুমি যদি এতই সাহসী, তা হলে সেদিন অলকদাকে দেখে ওরকম নার্ভাস হয়ে গেলে কেন?

মধুদি একটু লাল হয়ে বলে, ধ্যাৎ, নার্ভাস হব কেন?

একদম কেবলুর মতো লাগছিল তোমাকে সেদিন। আমি তো ভাবলাম তোমার বুঝি হয়ে গেল।

ওমা! কী হয়ে গেল? কী বলছিস যা-তা?

মা কী বলেছে জানো?

কী রে?

তোমাকে আর অলকদাকে নাকি খুব মানায়।

মধুদিকে এত লজ্জা পেতে কখনও দেখিনি।

এসব তো হয়ই। হয়েই যায়। হতেই থাকে। এর সঙ্গে ওর, ওর সঙ্গে তার। কেন যে হয় কে জানে বাবা! আমার কপালে তো একটা কাঠখোট্টা জুটেছে। দু'চক্ষে দেখতে পারে না আমাকে। এখনই গাঁট্টা মারতে চাইছে, তা হলে বিয়ের পর কী করবে? এত রাগ হচ্ছে আমার।

ঠিক দু'দিনের মাথায় জ্বর সাতানব্বইতে নেমে আমাকে এবারের মতো রেহাই দিল। শরীর ভীষণ দুর্বল। শুয়ে শুয়ে সকালে ফোনটা নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ মেসেজ। মেসেজ অবশ্য অনেক আসে। সেগুলো সব বাজে বিজ্ঞাপন। এটা বিজ্ঞাপন নয়। কাঠখোট্টা লোকটার মেসেজ—'কেমন আছো?' ইস, খুব দরদ দেখানো হচ্ছে এখন দায়সারা মেসেজ করে! আমিও রাগ করে জবাব দিলাম—'ভাল।' শুধু 'ভাল'। আর কিচ্ছু নয়। একটু বাদেই আবার মেসেজ—'সামনের জানালা দিয়ে নীচে তাকাও।' বুকটা ছলাৎ করে উঠল। এসেছে নাকি? শরীরের দুর্বলতা ভুলে গায়ের ঢাকনা ফেলে তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়ে হামলে পড়লাম। হ্যাঁ, ওই তো! সাইকেলে বসে একটা পায়ে সাপোর্ট রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি। হাত নাড়ল।

বুকজোড়া অভিমান কোথায় উড়ে গেল কে জানে। শুধু চোখ দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। বুক ভেসে যাচ্ছে আনন্দে। চোখে জল আসছে। হাত নাড়লাম।

একটু হেসে চলে গেল। বেশিক্ষণ থাকা তো নিরাপদ নয়। বাড়ির কেউ দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু এই কয়েক সেকেন্ডই তো অনেক। আর কী চাই আমার? এখন আমি লাফঝাঁপ দিতে পারি, নাচতে পারি, চেঁচাতে পারি আনন্দে।

অনেকক্ষণ পরে মা ঘরে এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, ও কী রে, একা একা হাসছিস কেন?

আমি পাগল হয়ে গেছি মা।

সে কী রে? কিসে পাগল হলি?

আনন্দে।